কথায় উপকথায় বিদ্যাসাগর

অশোক সেন

ভূমিকা

চারটি প্রবন্ধের সংকলন এই বই। বিভিন্ন আলোচনায় কোনো কোনো মন্তব্য আর দৃষ্টান্তের পুনরুক্তি পাঠকের চোখে পড়বে। প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্যের দরুন তার প্রয়োজন হয়েছে।

যে প্রবন্ধে বইটির আরম্ভ তা ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তার নামেই বইটির নাম। মহাপুরুষদের প্রসঙ্গে কথা উপকথার সঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তার প্রাচুর্যের যেন শেষ নেই। তাদের বিবরণ বা সত্য-মিথ্যা বিচার আমার আলোচ্য নয়। বিদ্যাসাগরের জীবন আর কাজের নানা দিক বুঝবার চেষ্টা করেছি। সেই বোঝাপড়ার সূত্রেই কথা উপকথার উৎস সন্ধান সম্ভব হতে পারে। তখন বাস্তবের তথ্য আর কল্পনার নির্মাণকে সর্বদা পৃথক করা যায় না। বিশেষত বিদ্যাসাগরের মতো কোনো কীর্তিমান, পরহিতৈষী জীবনের সত্য কথা উপকথায় মিশ্রিত অতিকথাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর কাছে সমাজের যা প্রত্যাশা, অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত 'আকাদেমি পত্রিকা'র নবম সংখ্যায় (এপ্রিল ১৯৯৬) "বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিভ্রান্তি" প্রথম বেরয়। ওই পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় সহবাস সম্মতি আইন ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছিল। লেখক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। "বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিভ্রান্তি"র বিষয়বস্তু সেই প্রবন্ধটির আলোচনা। 'এবং এই সময়' পত্রিকার গ্রীষ্ম (১৪০৫ ব.) সংখ্যায় রামকৃষ্ণবাবু সেই আলোচনার জের টেনে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা নিয়ে আমার বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। বিবাহ এবং সহবাস সম্মতি সমার্থক এমন কথা আমার লেখায় নেই। সহবাস সম্মতির বয়স নির্ধারণ এবং বৈবাহিক বলাৎকারের জন্য শাস্তিবিধান মিলিয়ে বাল্যবিবাহ নিবারণের একটা পরোক্ষ উপায় হতে পারে। তাই ছিল আমার বক্তব্য। আর গবেষণার ক্ষেত্রে 'প্রাথমিক' (primary) এবং হাতফেরতা (secondary) উৎস তথা source-এর পার্থক্য নিশ্চয় স্বীকার্য। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মূল বয়ানের সঙ্গে সুবলচন্দ্র মিত্রর বই থেকে আংশিক উদ্ধৃতিতে একটি শব্দেরও ফারাক ছিল না। তবে বিদ্যাসাগরের মূল প্রতিবেদনটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন তাতে খর্ব হয় না।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর শতবর্ষ (১৯৯১) উপলক্ষে সাহিত্য অকাদেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। তার কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন 'প্রয়াণের শতবর্ষে বিদ্যাসাগর' সাহিত্য অকাদেমি থেকে ১৯৯৩-তে প্রকাশিত হলো। ওই সংকলনে "বিদ্যাসাগর ও সমকালীন ধর্মচেতনা" প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ। সামান্য পরিবর্তনের পর প্রবন্ধটি এই বইতেও আছে। আর পূর্বোক্ত 'আকাদেমি পত্রিকা'র ষষ্ঠ সংখ্যায় (মে ১৯৯৪) বর্তমান বইয়ের শেষ প্রবন্ধ "আধুনিকের সীমানায় বিদ্যাসাগর"-এর প্রথম প্রকাশ। এসব অনুষঙ্গেও আমাদের বোঝাপড়ায় কথা উপকথার প্রলেপ লেগে থাকে।

সব উদ্ধৃতিতে তাদের নির্দেশিত সূত্রের বানান রাখা হয়েছে। অন্য রকম উল্লেখ না থাকলে প্রয়োজন মতো ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ আমি করেছি। নানা সময়ে গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, সৌরীন ভট্টাচার্য এবং স্বপন বসুর সঙ্গে আলোচনায় আমি উপকৃত। বইটির বিন্যাস এবং বক্তব্যের দায়িত্ব অবশ্য পুরোপুরি আমার।

বইটিতে নতুন গবেষণার পরিচয় বেশি নেই। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কাজের বিন্যাসে তাঁকে নিয়ে কথা উপকথার কেন এত প্রাচুর্য, তার হদিস পাওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

স্বপন মজুমদারের বারবার তাগাদা ছাড়া বইটি সম্ভব হতো না। সযত্নে বইটি ছাপার জন্য 'প্যাপিরাস' কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১ ডিসেম্বর ১৯৯৮

অশোক সেন

সূ চি

কথায় উপকথায় বিদ্যাসাগর

মতভেদে, রূপকে

বাংলা ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনাবসান। বছর চারেকের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনীগ্রন্থে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,

> সমাজ সংস্কারক্ষেত্রে আজ তাঁহার স্থান অধিকার করিবার কেহই নাই। তিনি যে বীরবেশে অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় জীবনের আবর্জনারাশি নির্বাচন, উত্তোলন, ও দূরে নিক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহার সে কার্যকলাপের উপযুক্ত সমাদর আমাদের নিকট হইতেছে না। আমরা সময় ও অবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সে মুক্তিশক্তি, মুক্তভাব, সে অতিমানব ঔদার্যের সমাদর কিরূপে করিব? তিনিই তাঁহার কার্যকলাপের তুলনাস্থল। তাঁহার অন্য তুলনা মিলে না। সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনে তিনি জনসমাজ সমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপরিমেয়তা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং জটিল সামাজিক প্রশ্নবিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার রণনৈপুণ্য কিরূপ বিচিত্রতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়-স্থল, তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল হইয়া থাকিবে এবং কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিতমাধুরী আরও সমুজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে। (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯৪ ব. : ৪৮৪-৮৫)

এই গ্রন্থের কয়েক মাস পরেই বেরলো বিহারীলাল সরকার রচিত অন্য একটি বিদ্যাসাগর জীবনী। তাঁর একটি মন্তব্যেই স্পষ্ট চণ্ডীচরণ কেন 'উপযুক্ত সমাদর' না হওয়ার প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিহারীলালের কথায়,

> বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্ম্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে; হিন্দুসমাজ বিশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অপরাধ কি? যিনি তাঁহার হৃদয়ে এত দয়া—পরদুঃখকাতরতা দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন কেন এমন হইয়াছিল। নতুবা বড় কথা কহিতে চাহি না, বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম

হয়, সে সময় ব্রাহ্মণের ঘরে নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করিত না, এমন লোক প্রায় দেখা যাইত না, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্ব্বস্ব গায়ত্রী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব কোন্ স্রোতে বহিবে, করুণাময় বাল্যকালেই ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়াছিলেন। (বিহারীলাল সরকার ১৩৮৮ ব. : ৩৮২)

প্রধানত সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে গ্রহণ বর্জনেই যা কিছু মতভেদ। ১৯০২তে প্রথম প্রকাশিত সুবলচন্দ্র মিত্রের ইংরেজি বিদ্যাসাগর জীবনীতেও (Subal Chandra Mitra 1975) সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাবের পরিচয় আছে। অন্যথায় বিদ্যাসাগরের অজস্র অন্য গুণাবলী সর্ববাদিসম্মত, আর তা নিয়ে আমাদের কথা ও কাহিনী, উপকথা, কিংবদন্তীর শেষ নেই। তেমন সব তথ্য, কাহিনী, উপকথার সম্ভারে (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২) একটি আকরগ্রন্থসদৃশ সংকলন প্রস্তুত করার জন্য আমরা ইন্দ্রমিত্রের কাছে কৃতজ্ঞ। মনে হতে পারে বাঙালি মধ্যবিত্তের অভীষ্ট আর আদর্শের যোগাযোগে বিদ্যাসাগরকে নির্মাণ ও উপস্থাপনার বিচিত্র এক প্রবণতা সমানে চলছে। বিহারীলালের মন্তব্যেও আমরা তাঁর মতো করে একরকম ইচ্ছাপূরণের নিদর্শন পাই, 'হিন্দুসন্তান বিদ্যাসাগরের এই আন্তরিকতা ও একাগ্রতা লইয়া, শাস্ত্রনিশ্চিত স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হয়, ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। এই প্রার্থনা লইয়াই "বিদ্যাসাগরে"র প্রকাশ।' (বিহারীলাল সরকার ১৩৮৮ ব. : ৩৮২-৮৩)

কথা আর উপকথার সমাহার নিয়ে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি মন্তব্য মনে পড়ে,

> হতে পারে তা (বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত সব কাহিনী) সঠিক সত্য, অথবা সম্পূর্ণ আজগুবি। যাই হক একজন অসাধারণ মানুষের বহু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রকৃতিকে আলোকিত করতে এসব কাহিনীর মূল্য অপরিসীম। বিশিষ্ট সব কাহিনী, মেজাজী তাদের প্রকৃতি, বিস্ময়ে ভরপুর। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই এমন শত শত গল্প আকাশে বাতাসে ভাসছিল। ছোট ছোট ধারায় আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে যেন, জলবিন্দুর মতো তাদের স্বচ্ছতা। স্ফটিকের মতো দানা বাঁধলে সেসব কাহিনীতে পরবর্তী প্রজন্মের বালক এবং মানুষদের অনেক উপকার হয়। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে অন্য কোনো লোকের বিষয়ে এরকম গল্প উদ্ভাবিত বা কথিত হয়নি। কথায় ও কর্মে বিদ্যাসাগরের কাছে যা প্রত্যাশিত, অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ধরাবাঁধা যায় না, তেমন সব কথার অল্প-কিছু মাত্র বিদ্যাসাগর জীবনবৃত্তান্তে গ্রথিত হয়েছে। কিন্তু তাদের নতুনত্ব, জোর, মেজাজ আর করুণা অনন্য ব্যক্তিত্বে এবং দুর্বার আকর্ষণে সক্ষম সেই মানুষটির সুস্পষ্ট আভাস আমাদের দিতে পারে। (**Nagendranath Gupta 1950 : 11-12**, বর্তমান লেখকের অনুবাদ)

সেখানেই কথা আর উপকথার মেলবন্ধনে বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য। তাঁর ব্যঞ্জনাতেই বিদ্যাসাগরের রূপক। সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের কর্ম ও চিন্তা নিয়ে নানাজনের মতভেদও তেমন রূপকের পরিসরে বোঝা অসম্ভব নয়।

‘ইঙ্গরেজী’

জীবনভর বিদ্যাসাগরের অনেক অভিজ্ঞতাই নিছক যা ঘটল তার ব্যঞ্জনায় অতিরিক্ত কিছু পরিশিষ্টের আবেদন রেখে যায়। বিদ্যাসাগর তখন নিতান্ত বালক। বাবার হাত ধরে কলকাতায় আসছিলেন পায়ে হেঁটে। পথে সেই ‘মাইলস্টোন’ সংশ্লিষ্ট ‘ইঙ্গরেজী অঙ্ক’ শেখার ঘটনায় তেমন আবেদনের সূচনা। সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র আর ঠাকুরদাসের সঙ্গে আরো ছিলেন গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের গুরুমশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং একজন ভৃত্য। সুদীর্ঘ হাঁটাপথে আট বছরের ঈশ্বরচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে প্রয়োজন মতো কাঁধে করে চলাই ছিল ভৃত্যটিকে সঙ্গে নেওয়ার উদ্দেশ্য।

পথে শিয়াখালায় শালুকের বাঁধা রাস্তায় পৌঁছলে ঈশ্বরচন্দ্রের চোখে পড়ল মশলা বাটবার শিলাখণ্ডের আকারে একটি পাথর রাস্তার ধারে পোতা আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তাহার কৌতূহল নিবৃত্তি করলেন ঠাকুরদাস। মাইল-স্টোন ইংরেজি কথা,—মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ, স্টোন শব্দের অর্থ পাথর। প্রতি এক মাইল অন্তর রাস্তার ওপরে এক একটি পাথর পোতা আছে, তাতে খোদা রয়েছে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক। সামনের পাথরটির অঙ্ক উনিশ। দেখলে লোকে বুঝবে এখান থেকে কলকাতার দূরত্ব উনিশ মাইল।

তারপরে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের কথায়,

> নামতায় “একের পিঠে নয় উনিশ” ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে

বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে-ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ তুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই। এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে-ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না ; অনন্তর, পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন্ মাইল ষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে ; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ গ. : ৪২৪-২৫)

ঈশ্বরচন্দ্রের আশ্চর্য কৃতিত্বে সকলেই মুগ্ধ। গুরুমশাই কালীকান্ত বললেন সযত্ন শিক্ষার সুযোগ পেলে ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভবিষ্যত অবধারিত। এদেশের প্রথম ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতা। 'ইঙ্গরেজী' অঙ্কে তার দূরত্বের নির্দেশিকা চিনতে চিনতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র সেই শহরে পৌঁছলেন। শিক্ষায়, পাণ্ডিত্যে, সমাজ কল্যাণ ও পরহিতের কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের অগ্রগণ্য মনীষী। কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্ধকার আবৃত করেছিল তার বহু প্রকল্প এবং তাদের সম্পূরণ। ঔপনিবেশিক গৌণতায় পদে পদে ব্যাহত বাঙালি মধ্যবিত্তের নাজেহাল সামাজিক ভূমিকা নিদারুণ দুর্বলতায় আচ্ছন্ন থাকে। আজীবন কুটিল সব জটিলতা, বিরুদ্ধতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তাঁর পারিপার্শ্বিকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের

অপদার্থতা নিয়ে চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আর ইংরেজের আধিপত্যেই তো সংশ্লিষ্ট 'ইঙ্গরেজী' অঙ্কে খোদিত পথনির্দেশ। তাকে চেনা-জানায় প্রথম দিনের উৎসাহ, আগ্রহ প্রায় গোটা শতাব্দী ব্যেপে ক্রমশ যেন এক মরীচিকার মায়ায় হারিয়ে যায়।

আবার 'ইঙ্গরেজীর অঙ্ক' শেখায় ঈশ্বরচন্দ্রের বুদ্ধি ও তৎপরতায় মুগ্ধ অনেকেই তাকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরদাসের মাস মাইনে তখন দশ টাকা। তার অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ টাকা হিন্দু কলেজের মাসিক বেতন। এই সমস্যার কথা প্রায় সব বিদ্যাসাগর জীবনীতেই আছে। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে উল্লেখ করেন 'হের সাহেবের' অবৈতনিক স্কুলের কথা যেখানে 'যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক; হিন্দু কালেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর, যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমা খরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেব-দিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম করিতে পারিবেক।' (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ গ. : ৪২৫)

'হের সাহেবের স্কুলে' ভর্তি হওয়ার সমস্যা ছিল। গরিব ছেলেদের হেয়ার সাহেবের পাল্কির পেছনে দিনের পর দিন দৌড়তে হতো, তাদের ব্যাকুল প্রার্থনা 'me poor boy, have pity on me, me take in your school.' দু-মাসের বেশি এমন দৌড়িয়ে রামতনু লাহিড়ি ভর্তি হতে পারেন। (শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯০৩ : ৪৫-৪৬) রামতনুর বয়স তখন তেরো। আট বছরের ঈশ্বরচন্দ্রের তেমন দৌড়ে যোগদান আরো দুঃসাধ্য।

কথা উপকথায় মিশ্রিত এমন অবস্থার চাপ অনস্বীকার্য। স্বরচিত চরিত-কথায় বিদ্যাসাগরের কথা ভুলবার নয়। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ গ. : ৪২৫-২৬) তবে ঠাকুরদাসের সিদ্ধান্তে একটা নির্বিকল্প নির্ধারণের ভাবনাও আমাদের মনে আসে। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ করে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার উপযুক্ত হতে পারেন ঈশ্বরচন্দ্র, তাই ছিল ঠাকুরদাসের একান্ত ইচ্ছা। দারিদ্র্যের চাপে ঠাকুরদাস পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি অবলম্বনে বঞ্চিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র আবার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠিত হবেন এমন আশা ঠাকুরদাস করতেন। আবার চাকরির মধ্যে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত ছাত্রদের পক্ষে আদালতে জজপণ্ডিত হওয়া সম্ভব। তার জন্য অবশ্য ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন আছে। শেষ পর্যন্ত

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি হন। ঠাকুরদাসের পক্ষে সামাজিক অবস্থান, পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিতে প্রত্যাবর্তন, আর্থিক সামর্থ্য সব মিলিয়েই একটা নির্বিকল্প নির্ধারণের কথা সঙ্গতি লাভ করে।

বিত্তহীন থেকে বিদ্যাসাগর

আট বছরের ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় প্রথম এলেন ১৮২৮ সাল। সেই বছরেই কলকাতায় আসেন নতুন গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। তাঁর বিশ্বাস এদেশে ইংরেজ শাসনে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। তবে বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে গ্লস্টার মিল, খনি শিল্প এবং অন্য কিছু উদ্যোগে ব্রিটিশ মূলধনের নিয়োগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। পথ নির্মাণ এবং নৌ-পরিবহনের যা কিছু উন্নতি তাতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অনুকূল পণ্য বেচাকেনার সুবিধাই প্রাধান্য পায়।

বেণ্টিঙ্কের শিক্ষানীতিতে ‘সভ্য ইওরোপের’ আবেদন বরং স্বচ্ছল বাঙালিদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়। যে কার্যনীতিতে ইংরেজি শেখার ওপর জোর পড়েছিল তার মুখ্য প্রবক্তা মেকলের সুপরিচিত উক্তি মনে পড়ে। নতুন শিক্ষানীতির সেই প্রধান উদ্দেশ্য, আমাদের বিশেষ কর্তব্য এমন একটি দেশীয় শ্রেণী গঠন, যারা কোটি কোটি শাসিত প্রজা এবং আমাদের মধ্যে দোভাষী ব্যাখ্যাকারের কাজ করবে ; এক শ্রেণীর লোক রক্তে বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, কথা এবং বুদ্ধিতে ইংরেজের মতো হবে।

সেকালের কলকাতায় ওই বাঞ্ছিত শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ার ইচ্ছা অমূলক ছিল না। ১৮২৮-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার-এ ওয়াল্টার হামিল্টন জানাচ্ছেন যে বানিয়া, মহাজন এবং জমিদারদের সমৃদ্ধি ইংরেজের আধিপত্যে, সেই প্রভুদের পরিচর্যা করে তাদের রক্ষণাবেক্ষণেই অর্জিত হয়েছিল। এভাবে কলকাতায় শাসক এবং শাসিতের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠছিল। ১৮৪২-এ একটি রিপোর্টে বুত্রোস বললেন যে কোনো ইংরেজকে নিজের মাতৃভাষায় সম্বোধন করতে হলে একজন দেশীয় ভদ্রলোকের মনে হয় তিনি যেন এক বর্ণচ্যুত অভাজন। তৎকালে ধনী বাঙালি-দের সঙ্গে সাহেবদের সামাজিক মেলামেশার নজির কম নেই। শতাব্দীর দুয়ের তিনের দশক থেকেই তার ব্যাপ্তি। রামমোহন রায়ের বাড়িতে জাঁকালো পার্টি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর শীতকালীন ঘোড়দৌড়ে রুপোর কাপ দিচ্ছেন এমন ঘটনাও বিরল নয়। (Sen 1977 : 10-11)

এই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র জীবনের সমকালীন পরিস্থিতি। ১৮৩৫ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত একটি শিক্ষা সমীক্ষা করেছিলেন জেমস কের। তাঁর বক্তব্য যে বৃত্তির আশায় শহরের সেরা পরিবারের ছেলেরা হিন্দু কলেজে পড়তে আসে না। তাঁদের অভিলাষ হলো সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধি, আর কোনো ক্ষেত্রে বা নিছক জ্ঞানার্জনের আগ্রহ। এমন কোনো বর্গের বাইরে ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন ও শিক্ষা। মেকলে-ট্রেভেলিয়নের শিক্ষানীতিতে সংস্কৃত কলেজ নিতান্তই এক গৌণ প্রতিষ্ঠান। ট্রেভেলিয়নের তো মত যে হিন্দু কলেজে ছেলেরা মাইনে দিয়ে পড়ে, আর সংস্কৃত কলেজে টাকা দিয়ে ছাত্র ভাড়া করতে হয়। (C. E. Trevelyan 1838 : 80-81)

এহেন সংস্কৃত কলেজেই ঈশ্বরচন্দ্র একুশ বছর বয়সে কলেজিয় অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল। কলকাতায় কিছুদিন তিনি একটি স্থানীয় পাঠশালায় পড়েছিলেন। তারপরে অসুস্থতার দরুণ বীরসিংহ গ্রামে ফিরে যান। এক বছরের মধ্যেই আবার কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, তর্কবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন শাখাতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর রচিত পদ্য এবং নিবন্ধে মৌলিকত্বের পরিচয় ছিল। সতের বছর বয়সে তিনি ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐচ্ছিক ইংরেজি শিক্ষাতেও কৃতিত্ব কম ছিল না। তবে ১৮৩৫-এ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থী হিসেবে তরুণ ঈশ্বরচন্দ্রের উৎকর্ষ প্রায় এক কিংবদন্তীর মধ্যে গণ্য হলো এবং ছাত্রজীবনেই তিনি অর্জন করলেন বিদ্যাসাগর উপাধি। কলকাতায় আসার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র তো নিতান্তই অন্তেবাসী এক গ্রাম্য বালক। জন্মসূত্রে পারিবারিক সম্পদ বা সামাজিক সম্মান কিছুই তাঁর নেই। অসাধারণ মেধা, কঠোর পরিশ্রম আর সুদৃঢ় শৃঙ্খলায় অনুপ্রাণিত বিরাট সাফল্যময় ছাত্রজীবন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের স্বীকৃতি ও গৌরবের সূচনা। জন্মসূত্রে যা তাঁর ছিল না, স্বীয় কীর্তিতে তিনি তা অর্জন করলেন।

এই কঠিন পরিক্রমা নিয়ে আশ্চর্য সব কাহিনীর অন্ত নেই। রাতে ঘুম তাড়িয়ে বেশি পড়বার জন্য কত উপায়ই না ঈশ্বরচন্দ্র অবলম্বন করতেন! কখনও চোখে তেল মাখছেন, কখনও মাথার চুলের গুচ্ছ দড়ি দিয়ে জানালার সঙ্গে বেঁধে রাখছেন যাতে ঝিমুনি এলেই টানের চোটে জেগে উঠবেন। আবার পাঠকালে ঘুম এলেই বাবার প্রচণ্ড প্রহার চলত। প্রত্যুষে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যাকরণ শিক্ষার পরীক্ষা করতেন ঠাকুরদাস। মুখস্থ শ্লোকে ভুল হলেই আবার প্রহার। ঘরে বাতি জ্বালাবার

তেল কম থাকলে ঈশ্বরচন্দ্র রাস্তায় গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়তেন। বিদ্যাসাগরের পটে এখনও মেদিনীপুরের পটুয়া তরুণ বিদ্যাসাগরের পাশে ল্যাম্প-পোস্ট আঁকেন। (Hatcher 1996 : 77) কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে ঠাকুরদাসের রাত হতো। গৃহকর্ম এবং রন্ধনকার্য প্রায়শ ঈশ্বরচন্দ্রের দায়িত্বে পড়ত। রান্নাঘরের পরিবেশ আদৌ পরিচ্ছন্ন ছিল না। বিশেষ তৎপর হলেও খাদ্যদ্রব্য আরশোলা থেকে মুক্ত রাখা ছিল দুরূহ ব্যাপার! একদিন আহার্য বস্তুতে আরশোলা পড়ে থাকায় কাউকে না বলে তা নিজেই গলাধঃকরন করেন ঈশ্বরচন্দ্র। বললেই তো অন্যের আহার নষ্ট। এবারে বিদ্যাসাগর কথায় বিদ্যানিষ্ঠা ও পাঠানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে বালক মনে পরার্থচিন্তার উন্মেষও ধরা যাচ্ছে। সাধ্যমতো নিজের বৃত্তির টাকায় অভাবী লোককে সাহায্য করতেন ঈশ্বরচন্দ্র, আর সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর রাত জেগে রোগীর শুশ্রূষাতে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না।

এসব কাহিনীতে ব্যক্তিবিশেষের সাধ্য অসাধ্যের বেড়া ভাঙছে কিনা সে প্রশ্ন নিশ্চয় অবান্তর। একটি মূল সত্যের প্রেরণাই তাদের সার্থকতা। অজস্র প্রতিকূলতার সঙ্গে সমানে লড়াই করে গ্রাম থেকে আগত দরিদ্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র নিজের মেধা ও শ্রমের অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন, কলকাতার কলেজে উচ্চশিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে পরিণত হলেন। সেই কীর্তি এত সব কথার উৎস এবং অনুষঙ্গ। কোনো অনিবার্য আকর্ষণে অনেকেই যেন তেমন কৃতিত্ব ও গৌরবে অমোঘ আবেদন উপলব্ধি করেন।

আবার বড়বাজারের দয়েহাটা থেকে সংস্কৃত কলেজ পর্যন্ত পথে নিত্য যাতায়াতে, অথবা নিজের বিদ্যালয়ের সন্নিহিত হিন্দু কলেজে নগরের প্রতিষ্ঠিত ও ধনী পরিবারের ছেলেদের আচার আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ও সঞ্চয়ের কথা আমরা বিশেষ জানি না। যে প্রতিষ্ঠানকে ট্রেভেলিয়ন সাহেব বলে-ছিলেন 'ভাড়া করা' ছাত্রদের বিদ্যালয় সেখানেই তো ঈশ্বরচন্দ্রের গৌরবময় ছাত্রজীবন এবং তার অসামান্য উত্তরণ। রবীন্দ্রনাথের সেই বর্ণনা মনে আসে— 'ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কলেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৭ ব. : ৪৮৯) আর ছাতার নিচের মানুষটিই বা চারপাশে কী দেখতেন? সরাসরি আমরা খুব জানি না। সম্ভবত বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে নিহিত ছিল তেমন চেনাজানা অনুভবের কোনো-না-কোনো প্রক্ষেপ।

উত্তরাধিকার ও উত্তরণ

তখনও মেকলের শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়নি। বেন্টিঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী একটি সমীক্ষার দায়িত্ব পেলেন উইলিয়ম অ্যাডাম। সমীক্ষার বিষয় বাংলা বিহারের জেলায় জেলায় তৃণমূলে ইংরেজ-পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮-এর মধ্যে অ্যাডামের তিন খণ্ড রিপোর্টের প্রকাশ। তার আগেই অবশ্য মেকলের শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে। পূর্বতন দেশী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক বা গুরুমহাশয়রা অনেকে কায়স্থ। এসব পাঠশালায় শিক্ষার বিষয় ও পরিমাণ নিতান্তই অল্প ছিল। তাদের পরিবর্ধন এবং উন্নতির সুপারিশ অ্যাডাম করেছিলেন। নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা কেবল ইংরেজিতে দেওয়া তিনি সমর্থন করেননি। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রগুলি টোল, চতুষ্পাঠীতে অবস্থিত ছিল। সনাতন সংস্কৃত পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে অ্যাডাম বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের বিনয়স্নিগ্ধ চরিত্র এবং সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের কথা। অন্যদিকে উজ্জ্বল তাঁদের পাণ্ডিত্য এবং বোধের পরিশীলন। তাঁদের দেখে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সাদাসিধে কৃষক জীবনের কথা অ্যাডামের মনে হয়। (Anathnath Basu ed. 1941 : 169-70)

নিজের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে অ্যাডামের এসব কথার সাদৃশ্য আছে, 'তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন! তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ গ. : ৪২০)

স্বজন কুটুম্ব কারও সঙ্গে রামজয় কোনো নীতিহীন রফায় রাজি ছিলেন না। পিতা ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর রামজয়ের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদর সংসারের কর্তৃত্ব নিলেন। ছোটখাটো বিষয়েই তাঁদের সঙ্গে রামজয়ের মনান্তর শুরু হলো। অপমানিত হয়ে রামজয় দেশত্যাগী হন। দুটি পুত্র এবং চারটি কন্যা নিয়ে শ্বশুরালয়ে থাকার চেষ্টা করেন বিদ্যাসাগরের পিতামহী দুর্গাদেবী। কিন্তু অযত্ন, অনাদর এবং লাঞ্ছনাভোগ চূড়ান্ত হলে তিনি পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে নিজের পিত্রালয়ে চলে আসেন। দুর্গাদেবীর বাবা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। সেখানে প্রথমটা দুর্গাদেবী ভাল ব্যবহার পান। তবে বিদ্যালঙ্কারের বার্ধক্যের দরুন তাঁর পুত্র, পুত্রবধুর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। তখন দুর্গাদেবীর পক্ষে পিত্রালয়ে থাকা অসম্ভব দাঁড়ায়। নিরুপায় বৃদ্ধ পিতা কন্যার জন্য স্বগৃহের অদূরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করে দেন।

সেখানে পুত্র-কন্যাসহ দুর্গাদেবীকে অতি কষ্টে দিন যাপন করতে হতো। চরকায় সুতো কেটে জীবিকা নির্বাহের প্রয়াসী ছিলেন দুর্গাদেবী। কাছাকাছি ক্ষীরপাইতে সুতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ের বড় বাজার ছিল। এমন উপায়ে অবশ্য সাতজনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হওয়া অসম্ভব। তাই জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস চোদ্দ বছর বয়সেই উপার্জনের উদ্দেশ্যে কলকাতা গেলেন।

গ্রামে থাকতেই ঠাকুরদাস সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর আশ্রয়দাতা জনৈক ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত বিদ্যার্জনের ইচ্ছা ঠাকুরদাসের ছিল। তবে বীরসিংহে মা ভাইবোনদের দুরবস্থার চিন্তায় তিনি সব সময়ে ব্যাকুল থাকতেন। চাকরি পেতে হলে ইংরেজি শিক্ষা নিতান্তই আবশ্যক। ঠাকুরদাসের অবস্থার লোকের পক্ষে তখন ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ প্রায় নেই। কোনোক্রমে কার্যোপযোগী ইংরেজি জানা এক ব্যক্তির কাছে ঠাকুরদাস নিছক কাজ চালাবার মতো কিছুটা ইংরেজি শিখলেন। তারপর মাসিক দু-টাকা বেতনে প্রথম চাকরি। সততা ও পরিশ্রমের গুণে ঠাকুরদাস যখন যাঁর কাছে কাজ করতেন, সকলেই তাঁর কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। দু-তিন বছরের মধ্যেই তাঁর মাসিক বেতন পাঁচ টাকা দাঁড়ায়।

ওদিকে প্রায় সাত-আট বছর পরে রামজয় তর্কভূষণ নিজের সংসারে ফিরে এলেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি কলকাতায় ঠাকুরদাসকে দেখতে যান। বড়বাজারের দয়েহাটা অঞ্চলে ভাগবতচরণ সিংহ নামে সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোক ছিলেন রামজয় তর্কভূষণের পূর্বপরিচিত। ভাগবতচরণের বাড়িতে ঠাকুরদাসের থাকার ব্যবস্থা হলো। রামজয় ঠাকুরদাসের বিয়ে ঠিক করলেন, পাত্রী গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবী। ভগবতী দেবী এবং ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ভগবতী দেবীর বাবা ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তবে তন্ত্রসাধনার প্রক্রিয়ায় তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়। তখন ভগবতী দেবীর মা গঙ্গাদেবী আপন পিত্রালয়ে আশ্রয় নেন এবং তাঁর বাবা অসুস্থ জামাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। ভগবতী দেবীর মাতামহ পাতুল নিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম পুত্র

সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কালক্রমে মধ্যম পুত্র পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন।

একটি কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃকুল ও মাতৃকুল সংস্কৃত জ্ঞান এবং অধ্যয়নের দীর্ঘ ঐতিহ্যে চিহ্নিত। অবস্থার দুর্বিপাকে ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাস সংস্কৃত বিদ্যার সুযোগে বঞ্চিত হলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবার নিজের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় কৃতী হবেন, এমন অভিলাষ ঠাকুরদাসের ছিল। অধ্যাপনা, শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর অতুল কীর্তি ও প্রতিভায় ধন্য হয়েছিলেন। তার বিস্তার ও কার্যক্রম চতুষ্পাঠীর চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ ছিল না।

উত্তরণের বৈচিত্র্য

১৮৪১-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু হলো। কাজ বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিত (সেরিস্তাদার), মাসিক মাইনে পঞ্চাশ টাকা। বিদ্যাসাগরকে ভাল চিনতেন সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব। দেশীয় ভাষা শেখা সিভিলিয়নদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে দেশে ফিরে যাওয়াই নিয়ম। সাহেবদের যোগাযোগ এবং দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু থেকে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বন্ধুদের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি জ্ঞান পাকাপোক্ত হয়। তদুপরি ইংরেজি ও হিন্দি শিখবার জন্য দু-জন শিক্ষককে কিছুকাল মাস মাইনেতে নিয়োগ করেন বিদ্যাসাগর। যথোপযুক্ত ইংরেজি শিখতে তিনি কোনো ত্রুটি করেননি।

প্রথম দিকে একবার মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে পরীক্ষার মান কিছুটা শিথিল করতে বলেন। রাজি হওয়া দূরের কথা, বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিতে চান। কর্মজীবনের আরম্ভেই এই কথা, যার আবেদনে চণ্ডীচরণ লিখলেন, 'গরিবের ছেলে, কল্পনাতীত দারুণ অভাবের মধ্যে জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটিয়াছে।' তবু 'সাহেবকে অসঙ্কোচে বলিয়া দিলেন বিন্দু প্রমাণ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবার পূর্বে "ও ছাই ভস্ম" পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯৪ ব. : ৬০) জীবনে অনেকবার নিজের সম্ভ্রম ও কর্তব্যবোধ এবং কর্তৃপক্ষের আদেশের মধ্যে বিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন বিদ্যাসাগর। নিজের বিবেচনায় যা অন্যায় তার কাছে তিনি কখনও নতি স্বীকার করেননি। তা রসময়

দত্তকে সেই জবাবেই হক—'দত্তমশায়কে বলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে-চাকরিতে সম্মান নেই সে-চাকরি করবে না।' (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ১৩২) ব্যালান্টাইন সাহেবের খবরদারি প্রতিরোধে প্রখর দৃঢ়তাতেই হক, আর শেষ পর্যন্ত জনশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে মতবিরোধের প্রতিক্রিয়ায় সরকারি চাকরি থেকে পদ-ত্যাগেই হক।

১৮৪৭-এ রসময় দত্তের সঙ্গে মতপার্থক্যের দরুণ সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দেওয়ার সময়ে কলকাতার গৃহে পোষ্য সংখ্যা ২০, যাদের অনেকেই নিরুপায় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় বালক ছাত্র। নিজে চাকরি পাওয়ার পর বিদ্যাসাগর চাননি যে, পিতা ঠাকুরদাস আর চাকরি করুন। বীরসিংহ গ্রামে বাবাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠাবার দায়িত্ব ছিল। বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের পর সংসারে মেজভাই দীনবন্ধুই একমাত্র পঞ্চাশ টাকা মাসিক রোজগার করতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের প্রাক্তন পদে তখন তিনি কাজ করেন। এমন কঠিন অর্থচিন্তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর অসম্মানজনক চাকরি করতে রাজি হননি।

উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে বিদ্যাসাগর স্বাধীন ব্যবসায়ের সূচনায় অগ্রসর হলেন। ধার করে মুদ্রণযন্ত্র কিনলেন বিদ্যাসাগর এবং তাঁর সমান অংশীদার মদন মোহন তর্কালঙ্কার। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হলো, আর মার্শাল সাহেবের পরামর্শে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। দুটি বইর একশো কপি মার্শাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য ক্রয় করেন। যন্ত্রক্রয় বাবদ ধার শোধ করতে পারেন বিদ্যাসাগর। এই উদ্যোগ পরে সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরিতে পরিণত হয়। স্বাধীন ব্যবসায়ের এমন চিন্তা ও তৎপরতা বিদ্যাসাগরকে আজীবন প্রতিকূল চাকরির দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়।

১৮৫০এ এডুকেশন কাউনসিলের সেক্রেটারি মোয়েট সাহেবের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হলেন বিদ্যাসাগর। এই কাজ নেওয়ার একটি নিহিত শর্ত ছিল যে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ হবেন। অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি থাকার সময়ে সংস্কৃত কলেজে যে সব সংস্কারের কথা বিদ্যাসাগর প্রস্তাব করেন, তার আরও পরিণত, পূর্ণাঙ্গ রূপায়নের সংকল্প তাঁর ছিল। রসময় দত্তের পদত্যাগে পাঠক্রম এবং অন্যান্য ব্যাপারে সংস্কারের বাধা রইল না। সেক্রেটারি অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারির পদ বিলোপ করে একজন অধ্যক্ষের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্থাপিত হলো।

পাঁচ বছর আগে যে পরিকল্পনা রসময় দত্ত গ্রাহ্য করেননি, তার আরও ব্যাপক, পরিবর্ধিত রূপ দেখা গেল এবার বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রস্তাবে।

আলোকপ্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিকে বিদ্যাসাগর সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিলেন। মার্জিত, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার নির্মাণে সংস্কৃত পণ্ডিতদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। তেমন দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত বিদ্যা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাস, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান—ইংরেজিতে জ্ঞাতব্য এই তিনটি শাখাও তার সঙ্গে যুক্ত হবে। নৈতিক এবং মনোদর্শন, যুক্তিবিদ্যা আর পলিটিকাল ইকনমির মধ্যে অন্তত একটি বিষয় প্রতি বছর উচ্চতর বৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যও হওয়া উচিত।

পাঠক্রমে সংযোজন, পরিবর্তনের ধরন থেকে পরিষ্কার যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থাকে কালোপযোগী করতে বদ্ধপরিকর বিদ্যাসাগর। অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি পদে তাঁর অল্পদিনের কার্যকালেই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল।

> আমরা আজকাল যে সংস্কৃত কলেজ দেখিতেছি বিদ্যাসাগর মহাশয় সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের পূর্বে ইহা এরূপ ছিল না। তখন পল্লীগ্রামের অধ্যাপকগণের প্রতিষ্ঠিত টোলের ন্যায় প্রায় এক প্রকার বে-বন্দোবস্তী আমল ছিল। সে কালে অধ্যাপক মহাশয়গণের সকলে না হউন, অনেকে চেয়ারে বসিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন, আর তাঁহাদের বালক শিষ্যগণ তালবৃন্তের দ্বারা ব্যজন করিয়া তাঁহাদের সুষুপ্তিজনিত তৃপ্তি বৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়েরা অনেক সময় নিদ্রা সুখ সম্ভোগান্তে অপরাহ্নে ছাত্রগণকে পড়াইতেন। পূর্বে সময়ের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে কে কখন আসিত, কে কখন যাইত, তাহার কোনোরূপ ব্যবস্থা ছিল না। যখন যাঁহার ইচ্ছা হইত তিনি তখন আসিতেন, যখন যাঁহার যাইবার ইচ্ছা হইত, তিনি তখন চলিয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের কার্যভার গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে অধ্যাপক মহাশয়ের নিদ্রা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের যাওয়া-আসার সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন।...মোট কথা সংস্কৃত কলেজে তাঁহার সহকারী সম্পাদক রূপে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার স্বেচ্ছাচারিতার স্থানে বিধিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯৪ ব. : ৭৬)

অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে পরিবর্তনের এই ধারা আরও পরিণত হলো।

সংস্কৃত কলেজে পড়বার অধিকার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগরের সুপারিশে কায়স্থরা সেই সুযোগ লাভ করলেন। অন্যান্য শূদ্রবর্ণের প্রবেশাধিকারে বিদ্যাসাগরের আপত্তি ছিল না। তবে সনাতন পণ্ডিতসমাজ এবং গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তি থাকায় বিদ্যাসাগর তেমন সুপারিশ করেননি। পঞ্জিকার কড়াকড়ি বাদ দিয়ে রবিবারে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ধার্য হলো।

প্রধান প্রধান হিন্দু দর্শনসমূহ পড়বার পক্ষে বিদ্যাসাগর মত দেন। কারণ এই নয় যে তাদের বক্তব্য অভ্রান্ত। ইংরেজি দর্শনে পরিচিত হওয়ার পর হিন্দু দর্শনের সঙ্গে তার তুলনামূলক বিচার সম্ভব। উভয় দর্শনে বোঝাপড়ার প্রয়োজন তাই অবশ্যস্বীকার্য। আবার পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তাকে দেশীয় ভাষায় বিন্যস্ত করতে উপযুক্ত পরিভাষার প্রয়োজন। হিন্দু দর্শন পড়া থাকলে তার সুরাহা হয়।

সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে এসে বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন সাহেব যে রিপোর্ট দেন, সে সম্বন্ধে মন্তব্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির পরিচয় আছে। মিলের লজিকের কোনো সংক্ষিপ্তসার নয়, মূল বইটি পড়বার কথায় বিদ্যাসাগর জোর দেন। বিশপ বার্কলের *Inquiry* বইটি তিনি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হননি। বার্কলের দর্শনে বস্তুবিশ্বের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, একমাত্র চেতনাই সত্য। এই প্রসঙ্গেই বিদ্যাসাগরের সেই উক্তি যে সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন। তাদের প্রতি হিন্দুদের বিশেষ শ্রদ্ধার দরুন এবং সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজনে ওসব দর্শন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যাসাগরের মতে বার্কলের দর্শনও ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন সাংখ্য ও বেদান্তের প্রতিষেধক ইংরেজি দর্শনের অধ্যয়ন। বার্কলের বইটি প্রতিষেধক নয়, বরং ভ্রান্ত সাংখ্য বেদান্তের পরিপূরক।

ব্যালান্টাইনের আশঙ্কা ইংরেজি ও সংস্কৃত পাঠপদ্ধতির মিশ্রণে ছাত্রদের ভুল ধারণা হতে পারে যে 'সত্য দ্বিবিধ'। বিদ্যাসাগরের মতে, যেখানে দুটি সত্যের মধ্যে আন্তরিক মিল আছে, তা বুদ্ধিমান ছাত্র ঠিকই বুঝতে পারবে। তদুপরি সর্বক্ষেত্রে হিন্দু দর্শনের মৌলিক সত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শন করা অসম্ভব। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ছিল যে বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো যায় না। আর জোর করে সামঞ্জস্য তৈরির চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে দেশীয় পণ্ডিতদের বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল কুসংস্কারগুলির কঠোর সমালোচনা করেন বিদ্যাসাগর। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৬৬০ ; বিনয় ঘোষ ১৯৭৩ : ১৭৯)

১৮৫৫-তে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদের অতিরিক্ত একটি কাজের ভার পান বিদ্যাসাগর। তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডের ইচ্ছানুযায়ী তিনি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার স্কুলগুলির সহকারী-ইনস্পেকটর নিযুক্ত হলেন। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় জেলায় জেলায় অনেক বাংলা মডেল স্কুল স্থাপিত হলো। শিক্ষার মানোন্নতির জন্য একটি নর্মাল স্কুল শুরু হলো। স্থান সংস্কৃত কলেজের বাড়ি, প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত। সেখানে শিক্ষকরা পড়তেন। বলা যায় বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষকতার উন্নতি উভয় দিকে জোর পড়ল। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে বেথুনের সহযোগী ছিলেন বিদ্যাসাগর। সহকারী-ইনস্পেকটর থাকার সময়ে জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরকম কিছু স্কুলের ক্ষেত্রে আগে সরকারি অনুমোদন নেননি বিদ্যাসাগর। তাঁকে মৌখিক উৎসাহ এবং সমর্থন হ্যালিডে দিয়েছিলেন। তবে সরকারি শিক্ষার অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করলেন না। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক নিয়োগ আর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের প্রশ্নেও তাঁদের মতভেদ হয়েছিল। ওসব স্কুলের ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য মেলেনি। এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ।

এখানেই বিদ্যাসাগরের চাকরি জীবন শেষ। তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ। সেই যে প্রথমবার সংস্কৃত কলেজে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা শুরু করেন, এতদিনে তা হয়েছে 'সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি' নামক একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। সংস্কৃত কলেজ এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যস্ততায় কিছুদিন বিদ্যাসাগর ব্যবসায়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেননি। যাই হক এবারে পদত্যাগের এক বছরের মধ্যে বিশেষ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিয়োগ করে নিশ্চিন্ত হলেন। ১৮৫৮-র আগে 'বর্ণপরিচয়' দুটি ভাগ এবং 'বোধোদয়' সমেত বিদ্যাসাগর-রচিত অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। 'বর্ণপরিচয় (১ ও ২)' আর 'বোধোদয়' ছিল তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় বই। বিদ্যাসাগরের জীবনকালে এই বই তিনটির শতাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আর 'বইগুলির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৮৭০ থেকে "বর্ণপরিচয়" প্রথম ভাগ প্রতি সংস্করণে ২০,০০০ করে ছাপা হতো, পরে প্রতি সংস্করণে মুদ্রণ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০,০০০। "বর্ণপরিচয়" দ্বিতীয় ভাগ প্রথম দিকে ১০,০০০ করে ছাপা হতো, পরে মুদ্রণ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,০০০-এ। "বোধোদয়"-এর প্রতি বছর চার-পাঁচটি করে সংস্করণ হতো। ১৮৮৪ থেকে প্রতি সংস্করণে ২০,০০০

করে বই ছাপা হতো। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য সফল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে "কথামালা", "বাঙ্গালার ইতিহাস", "আখ্যানমঞ্জরী", "শকুন্তলা", "চরিতাবলী", "সীতার বনবাস", "উপক্রমণিকা",…ও "ব্যাকরণ কৌমুদী"-র নাম করা যায়।… বিদ্যাসাগরের নিজস্ব বইগুলি ছাড়াও সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি প্রকাশিত অনেক বই সেকালে ভীষণরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করে।' (স্বপন বসু ১৯৯৪ : ১২৬-৭)। ঐতিহাসিক বাকল্যাণ্ডের হিসেব অনুযায়ী বছরের পর বছর প্রকাশনা থেকে বিদ্যাসাগরের মাসিক আয় তিন থেকে সাড়ে চার হাজার টাকার মতো ছিল। (স্বপন বসু ১৯৯৩ : ১৮৭)

পুস্তক ব্যবসায়ে এই সাফল্য বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার উন্নতিতে সংশ্লিষ্ট। আর 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' এবং 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর সাহিত্য সৌষ্ঠবে বাংলা গদ্যের গঠন সমৃদ্ধ হলো দেশজ রীতি, ইংরেজি ও সংস্কৃত প্রভাবের সযত্ন গ্রহণে বর্জনে। কথোপকথনের মতো সাধারণ বাচনভঙ্গির কাছাকাছি বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনা প্রাঞ্জল এবং বাহুল্যবর্জিত। আর সেখানে না আছে ছন্দের অভাব, না রঙের। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৭ ব. : ৪৭৮)

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আর একটি বড় কাজ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। নিম্নবিত্ত ভদ্র সন্তানেরা অল্প মাইনেতে উচ্চ শিক্ষালয়ে পড়তে পারে তাই ছিল উদ্দেশ্য। উত্তর কলকাতায় শংকর ঘোষ লেনে ছিল 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল'। ১৮৫৯এ সূচনা। কালক্রমে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতবিরোধে কিছু সভ্য আলাদা হয়ে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং আকাডেমি' নামে অন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যরা প্রাক্তন বিদ্যালয়টির তত্ত্বাবধানে বিদ্যাসাগরকে আমন্ত্রণ জানান। ১৮৬৪তে স্কুলের নাম হলো 'হিন্দু মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউশন'। তখন বি.এ. পর্যন্ত পাঠের অনুমোদন প্রার্থী একটি আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে নামঞ্জুর হয়। ইংরেজ শিক্ষক ব্যতীত ইংরেজিতে শিক্ষা অসম্ভব, এই ছিল ইংরেজ অধ্যুষিত তৎকালীন সিণ্ডিকেটের অভিমত। ১৮৭২এ আবার আবেদনের পর উচ্চশিক্ষার অনুমোদন পাওয়া গেল। তখন মেট্রোপলিটনের কমিটিতে কৃষ্ণদাস পাল এবং দ্বারকানাথ মিত্র যোগ দিয়েছেন। শিক্ষক নির্বাচন, উঁচু মানের সুশৃঙ্খল লেখাপড়া, লাইব্রেরীর যথোপযুক্ত সংগ্রহ ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে প্রখর, অক্লান্ত অভিনিবেশ বিদ্যাসাগরের ছিল।

পরীক্ষার ফল বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হতো। ইংরেজের পরিচালনা এবং শিক্ষকতা ছাড়াও ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা ভালভাবেই সম্ভব, বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন তার প্রথম নিদর্শন। আর 'আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।...সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরেজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৭ ব. : ৪৯৩)

সমাজ-অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি

বিদ্যাসাগরের শিক্ষার আদর্শ আর কর্মনীতির ধারণায় সেদিনের সামাজিক গতি-প্রকৃতির বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন। ১৮২৮এ পিতা ঠাকুরদাসের হাত ধরে আট বছরের বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন। এদেশে প্রথম ঔপনিবেশিক শহর কলকাতায় দেশীয় সমাজের বিন্যাস তখন কী ছিল? পাঁচ বছর আগে 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তিকায় তার কয়েকটি দিক আলোচনা করেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি স্তরে বিভক্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের কথা সেখানে আছে, ভবানীচরণের আখ্যামতো 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা'। (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৩ ব. : ৮-৯)

ভবানীচরণের কথায় অসাধারণ 'ভাগ্যবান' লোকদের তেজারতি সুদ ও জমিদারি উপস্বত্ব থেকে যা আয়ের পরিমাণ তাতে 'ন্যায্য' ব্যয়ের পর প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে। এদের জীবিকার জন্য শ্রমের প্রয়োজন নেই। প্রধান প্রধান কর্ম ছিল দেওয়ানি, মুৎসুদ্দিগিরি, কখনও-বা শাসকের অনুগ্রহধন্য সওদাগরি। অর্থাগমের প্রাচুর্যে তাদের প্রাধান্য। প্রতি ক্ষেত্রেই এঁদের মোটা উপার্জন ইংরেজ শাসকের তাঁবেদারিসাপেক্ষ। বিষয়কর্মে কিছুটা শ্রমের প্রয়োজন আছে। তবে অবসরের অন্ত নেই। রুচিভেদে অবসর সময় জুড়ে থাকত কোনো ক্ষেত্রে অধ্যয়ন, কখনও-বা ধর্মকর্ম, ক্ষেত্রবিশেষে ইয়ার মোসাহেবদের সঙ্গে আড্ডা, আবার কখনও-বা রক্ষিতার গৃহে গমন। জমিদার, বানিয়া, মুৎসুদ্দিদের বলা যায় সেদিনের অভিজাত মধ্যবিত্ত। ভবানীচরণের কথায় ধনাঢ্য ভদ্রলোক।

দোকানদার, ছোট ব্যাপারী, ছোট জমিদার, সরকারি এবং সওদাগরি অফিসের কর্মচারী, উকিল এবং লেখকদের নিয়ে গড়ে ওঠে এক গৃহস্থ মধ্যবিত্ত

গোষ্ঠী। উপার্জনের ব্যবধানে তারা উচ্চবিত্তদের থেকে আলাদা। মোটামুটি স্বচ্ছল জীবনযাত্রার জন্য তাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো।

সবার নিচে দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক। তাহাদের পক্ষে নিছক গ্রাসাচ্ছদন প্রচণ্ড পরিশ্রমসাপেক্ষ—'কেহ মুহরি কেহ মেট কেহবা বাজার সরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয়২ করিতে হয় না করিলেও নয় পোড়া উদরের জ্বালা।' (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৩ ব.: ৯) এঁদের অনেকেই কলকাতায় বহিরাগত, নিজেদের আদি নিবাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, কারণ ঔপনিবেশিক পালাবদলে বহুক্ষেত্রে তাঁদের সাবেকি জীবিকার সব উপায় ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যায়।

মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশ আয়বৈষম্যে চিহ্নিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদাররা প্রাচীন আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, আর প্রকৃত সামাজিক উৎপাদনে সরাসরি শ্রমের সম্পর্ক এই মধ্যবিত্তের কোনো বিভাগেই নেই। কম হক, বেশি হক যা তাদের জীবিকা, সেসব প্রকরণে কোনো উৎপাদনের সামগ্রী বা ভোগ্যদ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে না। আগাগোড়া সার্ভিস জাতীয় কাজের তথা অর্থনীতির তৃতীয় প্রকরণ ক্ষেত্রের (tertiary sector) বাহুল্য। কৃষি থেকে জমিদাররা উদ্বৃত্ত আদায় করে, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষি উৎপাদনের দায়িত্ব বা উন্নতিতে তাদের ভূমিকা ছিল নিতান্ত বিরল। ইউরোপে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িয়েছিল সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং ধনতান্ত্রিক পরিবর্তন। বাঙালি মধ্য-বিত্তের স্থচনা ও বিকাশে তেমন কোনো যোগাযোগ দেখা যায়নি।

১৮৮৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বক্তৃতায় হাণ্টার প্রায়োগিক শিক্ষার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেন। তাঁর বক্তব্য শ্রম সবচেয়ে সস্তা এদেশে, আর ইংল্যাণ্ডে মূলধন; তাদের সহযোগে বাংলায় শিল্পবিকাশের সম্ভাবনায় প্রতি হাণ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারত অবশ্য ব্রিটিশ বিনিয়োগের প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়নি। বরং উদ্বৃত্তের উৎস হিসেবেই তার গুরুত্ব। ব্রিটিশ বিনিয়োগ যা হয়েছিল তার মধ্যে পড়ে রেল এবং নৌ-পরিবহন, চা, পাট, কয়লাখনি, ব্যাঙ্কিং আর সওদাগরি প্রতিষ্ঠান। এসব ক্ষেত্র থেকে পরিষ্কার যে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কাঁচা মালের উৎসরূপে ভারতকে ব্যবহার। শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের তুলনায় নয়া পৃথিবীর (New world) বিভিন্ন দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় অনেক বেশি ব্রিটিশ বিনিয়োগ হয়েছিল। (Sen 1977 : 46)

পরাধীন অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল একটি বিরল ঘটনা। এদেশে ১৮১৩-তে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হলে দেশীয় বস্ত্র ও বয়ান শিল্পের প্রচুর বিড়ম্বনা দেখা দেয়। দেশজ বস্ত্র ও বয়ান শিল্পের ভাঙন সেখান থেকে শুরু। সস্তায় কলে তৈরি ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা তার কারণ। তবে কৃষিজাত দ্রব্য, নীলের মতো পণ্যের চাহিদায় এদেশের মোট রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশি ছিল। তার কার্যকারণে অবশ্য তখনও বিদেশী জিনিসের আমদানি দেশীয় রপ্তানির তুলনায় কম হওয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে রপ্তানির এই উদ্বৃত্ত দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ কাজে আসেনি। তার অনেকটাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেয়, যা তাদের বিলেতে ভারতীয় প্রশাসনের ব্যয় বাবদ দিতে হতো। ইংরেজ কর্মচারীদের পেনসন, ছুটিতে স্বদেশে যাওয়া আসার খরচ ছিল প্রচুর। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত দায়েও স্বদেশে টাকা পাঠাত। এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের পাওনা সুদও কম নয়। রপ্তানির যা উদ্বৃত্ত তার বিরাট অংশে এমনভাবে প্রদেয় হওয়ার যে বাধ্যবাধকতা তাতে রপ্তানিকারক দেশের লাভ নেই।

সুতা এবং সুতিবস্ত্রের রপ্তানি কমবার পরে কৃষিজাত দ্রব্য আর নীলের মতো পণ্যের বিক্রিতে আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি ছিল। অবশ্য উল্লিখিত বাধ্য-বাধকতায় দেশীয় অর্থনীতির যে তিমিরে সেই তিমিরেই দিন কাটে। তদুপরি নীলের বাজারে মন্দার দরুণ ১৮৪৭-এ এক ঘোরতর বিপর্যয়ে পড়ে বাংলার অর্থনীতি। নীলে মাত্রাতিরিক্ত বিনিয়োগ এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ে তার সংলগ্ন দেশীয় মূলধনের দুরবস্থা চরমে পৌঁছয়। স্বদেশের বাজারের ওপর ভিত্তি করে, তার কাঁচামাল ব্যবহারকারী কোনো শিল্পের হদিস মেলে না। রেল পরিবহন বিস্তারের পর বস্ত্রশিল্প তো বটেই অন্য দেশজ শিল্পেও ধস নামল। রেলপথে সস্তা বিলেতি পণ্য দেশের বাজারে ছড়িয়ে গেল। ১৯০১-এর সেন্সাস রিপোর্টে ছুতোর, কুমোর, চর্মকার ইত্যাদি অনেক বৃত্তিতে দুর্দশার চিত্র আছে। (Sen 1982 : 67-73) চটের মতো বিদেশী পুঁজিপ্রধান রপ্তানি নির্ভর শিল্পের কোনো ব্যাপক কার্যফল ছিল না। সব মিলিয়ে কলকাতা হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনারিক্ত এক ঔপনিবেশিক শোষণের স্নায়ুকেন্দ্র।

দেশজ শিল্পে ভাঙনের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল পরিবর্তনের যোগাযোগ ছিল। খাজনা, আবওয়াব ইত্যাদি বৃদ্ধির চাপে কৃষকের কাছে উৎপাদনে উন্নতির সম্বল থাকত না। কৃষিতে দুরবস্থার কথা ১৮৮১-র দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে সবিস্তারে বিবৃত হয়। পুরনো হাল লাঙল, সারের অভাব, অপুষ্ট, দুর্বল গবাদি-

পশু, সেচের অব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ সেখানে ছিল। আদায়ীকৃত খাজনার উদ্বৃত্ত থেকে কৃষির উন্নতিতে জমিদারদের প্রায় কোনো অবদান থাকত না। তাঁদের অনেকেই নাগরিক শিক্ষা সংস্কৃতি, ভোগ সুখে আকৃষ্ট ছিলেন। জমিদারদের সঙ্গে প্রাথমিক বন্দোবস্তে মোট জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশে কোনো রাজস্ব সরকারের প্রাপ্য ছিল না। সে ব্যবস্থা জমিদারদের অনাবাদী জমিতে কৃষির বিস্তারে উৎসাহিত করবে এমন চিন্তা সরকারি কর্মনীতিতে গুরুত্ব পায়। অবশ্য রাজস্বমুক্ত জমিতে প্রথমটায় চাষীরা খাজনা থেকে অব্যাহতি পেলেও কৃষি কাজের পত্তন গড়ে উঠলে চাষীর দেয় খাজনার বোঝা বাড়তে থাকে। আর এইভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়নের অন্ত নেই। উনিশ শতক ব্যেপে জমিদারি খাজনা তিন গুণের মতো বৃদ্ধি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মোটামুটি বাঁধাধরা ছিল ভূমিরাজস্ব। খাজনা ও রাজস্বের ব্যবধান অবলম্বনে জমিদারের নিচে ধাপে ধাপে মধ্যস্বত্বের বহু স্তর গড়ে ওঠে। এভাবে পত্তনীদার, হাওলাদার, গাঁতিদার, জোতদার ইত্যাদি নানা মধস্বত্বের উৎপত্তি।

দেশজ শিল্প বিনাশের দরুন জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষির বিকল্প কাজকর্ম ভয়ানক কমে যায়। কৃষির ওপরে চাপ সমানে বাড়তে থাকে। এমনকি রায়তি প্রজাস্বত্বে যাঁদের জমি ছিল তাঁরাও সে জমি খাজনাবিলি করে বেশি আয়ের সুযোগ পেতেন। এই প্রক্রিয়ায় কোর্ফা, উঠবন্দী, আধিয়ার, বর্গাদার প্রভৃতি নানা ধরনের অরক্ষিত চাষীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। তেমন চাষী অবশ্য জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের একতিয়ারেও ছিল। অরক্ষিত কারণ তাদের যদৃচ্ছ খাজনাবৃদ্ধি এবং জমি থেকে উৎখাত হওয়ার কোনো বিধিসম্মত প্রতিবন্ধক নেই। ১৮৮৫-র প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের সময় বিভিন্ন সমীক্ষা ও আলোচনায় এসব সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

যেমন বোর্ড অব রেভিনিউর তৎকালীন একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ-যোগ্য। তার বক্তব্য এই যে প্রজাস্বত্বের নিচের ধাপে আইন করে খাজনাবৃদ্ধি রোধ এবং জমি থেকে যদৃচ্ছ উচ্ছেদ বন্ধ করলেও বিপরীত ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। ফসলের দাম এবং জীবিকার প্রয়োজনে কৃষিজমির চাহিদা সমানে বাড়বার দরুন সেই নিচু ধাপের স্বত্ববান রায়তও নিজচাষে বিরত হবে, জমির খাজনাবিলিতে আগ্রহী হবে। তার দেয় আইনমাফিক খাজনা এবং অরক্ষিত চাষীর কাছে প্রাপ্য খাজনার মধ্যে ব্যবধানটাই তখন মূল আকর্ষণ হয়ে পড়ে। (Sen 1977 : 113) দেশজ শিল্পের ভাঙনে জীবিকার যে সমস্যা তার সমাধান ব্যতীত কেবল প্রজা-

স্বত্বের প্রকারভেদে উৎপাদনের উন্নতি ছিল সুদূরপরাহত। সেই কঠিন সমস্যার মধ্যে শতাব্দীর শেষ। ১৮৮৫-র প্রজাস্বত্ব আইনে স্থিতিবান প্রজা (occupancy ryot) জমিদারি যথেচ্ছাচার প্রতিরোধের অধিকার পেয়েছিল। তবে অন্য যারা মাঠে কাজ করে ফসল ফলাতো তাদের একটি বৃহৎ এবং বর্ধমান অংশের দুরবস্থা প্রতিকারের কোনো বন্দোবস্ত হয়নি।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নানা স্তর কৃষিজমি থেকে খাজনার স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। ভবানীচরণের ভাগ্যবান জমিদাররা তো সর্বোচ্চ স্তরের অধিবাসী। তবে শতাব্দী ব্যেপে বড় জমিদারির সংখ্যা কমে আসে। বাংলা বিহারের আটত্রিশটি জেলায় ৮৮ শতাংশেরও বেশি জমিদারি আয়তনে ৫০০ একরের কম জমিতে নেমে যায়। (Sen 1977 : 111) সংখ্যায় কম হলেও বড় জমিদারদের প্রতাপ বজায় ছিল। প্রজাস্বত্ব আইনে অবশ্য তাদের যথেচ্ছাচার কিয়দংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যপক্ষে উকিল, সরকারি বেসরকারি কর্মচারী, করণিক, শিক্ষক প্রভৃতি নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা কৃষিজমিতে নিরাপদ বিনিয়োগের উপায় খুঁজে পান।

'সাধারণী' পত্রিকার ১৮৮১-র ১৩ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'রাহুতা প্রজা সমিতি'র একটি মিটিঙের বিবরণ ছিল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। সেই মিটিঙে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে জমি খাজনাবিলির অধিকার সর্বস্তরের রায়তকে দেওয়া চাই। ওই পত্রিকাতেই ১৮৮৪-র ১০ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লেখা হলো যে নিজ হাতে চাষ না করলেও যারা জমি থেকে খাজনা উপার্জন করেন, তাদের স্বার্থের সরকারি রক্ষণাবেক্ষণ বিধেয়। সে বছর ২৫ মের সংখ্যায় 'সাধারণী'র একটি মন্তব্য ছিল যে কৃষিতে প্রজাস্বার্থের উন্নতি করতে হলে তাদের মধ্যস্বত্বভোগের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য পত্রপত্রিকার সূত্র থেকেও এরকম দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা সম্ভব। জমিদার তো বটেই, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অন্যান্য স্তরেও কৃষিজমি থেকে খাজনা আদায় গুরুত্ব পেতে থাকে।

শিক্ষার আদর্শ সাম্রাজ্যের প্রতিবন্ধ

ভবানীচরণের বর্ণবিভাগে যাঁরা দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক, সমাজের সেই স্তরে জীবন শুরু করেন ঈশ্বরচন্দ্র। বড় হয়ে তিনি পেলেন বিদ্যাসাগরের স্বীকৃতি। তারপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজের সময়ে অনেক কৃতবিদ্য ইংরেজ সিভিলিয়নের

সঙ্গে তাঁর নিকট পরিচয় হলো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেডরিক হ্যালিডে, সীটন কার, সিসিল বীডন এবং আরও অনেকে। কলেজের সেক্রেটারি এফ. জে.ময়েট এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে পরস্পরের গুণগ্রাহী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের তৎপরতা আর অধ্যবসায়ের কথা আগেই লিখেছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তনে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হন, তার দুটি বৈশিষ্ট্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় অর্জিত পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানকে এদেশের শিক্ষাবস্তু এবং শিক্ষণ প্রণালীতে সন্নিবদ্ধ করতে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট আগ্রহী। আর বিদ্যাসাগরের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকের আগমন বাংলা গদ্যের সুষ্ঠু নির্মাণের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃত কলেজ নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এসব উদ্দেশ্য। সনাতন পাণ্ডিত্যের সম্পর্কে ঠিক কোনো 'প্রাচ্যপন্থী' পক্ষপাত বিদ্যাসাগরের ছিল না। অন্যপক্ষে মাতৃভাষার প্রতি 'অ্যাঙ্গলিসিস্ট' অবহেলারও তিনি ঘোর বিরোধী। তবে উন্নত ইংরেজি এবং সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব আছে। ব্যালান্টাইন প্রতিবেদন সম্বন্ধে মন্তব্যে বিদ্যাসাগর লেখেন।

> ...এদেশের পণ্ডিতদের কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। তাঁদের তোষণ করারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ তাঁদের কোনো সাহচর্য না পেলেও আমাদের শিক্ষাসংস্কারের কাজ চলবে। আজ এইসব দেশীয় পণ্ডিতদের মর্যাদাও প্রায় লোপ পেয়েছে। কাজেই তাঁদের ভয় করার কোনো কারণ দেখিনা। পণ্ডিতদের কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। মনে হয় না, তাঁরা তাঁদের আগেকার প্রতাপ-প্রতিপত্তি আবার ফিরে পাবেন। বাংলাদেশে যেখানেই শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। (বিনয় ঘোষ ১৯৭৩ : ১৮০)
>
> ...আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে দিন, প্রধানত বাংলাভাষার উন্নতির জন্য। তার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ দিন। এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিদ্যার প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংরিজিবিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে। (বিনয় ঘোষ ১৯৭৩ : ১৮২)

১৮৩৫-এ মেকলের প্রস্তাব থেকে শুরু করে ১৮৫৪তে তৎকালীন ভারত সচিব

স্যার চার্লস উড-এর শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে ঔপনিবেশিক বিধিব্যবস্থার যে প্রবণতা পরিস্ফুট, মোটের ওপর বিদ্যাসাগরের মতামত তার বিরুদ্ধে নয়। তবে একটি পার্থক্যের কথা স্বীকার্য। বাংলা শেখার প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়ে বিদ্যাসাগর যে কেবল শিক্ষার বিস্তারে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিলেন তাই নয়, ওই ভাষাকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত করে তুলবার অভিপ্রায়ে একরকম স্বাবলম্বনের সংকেতও সেখানে পাওয়া যায়। তেমন স্বাবলম্বনে আর একটি প্রশ্ন জড়িত। ইংরেজি মাধ্যম ব্যতিরেকে শিক্ষার সূচনাও অনায়ত্ত হলে, বৃহত্তর জনশিক্ষা তো দূরের কথা, মধ্যবিত্তের অনেক স্তরেই তার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য হতো।

এখানেই আবার পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগরের অসাধারণ কৃতিত্ব। পাঁচ সাত বছরের মধ্যে 'বর্ণপরিচয়' থেকে 'আখ্যানমঞ্জরী' পর্যন্ত পুস্তকাবলীতে বিদ্যাসাগর শৈশবের প্রারম্ভিক বর্ণজ্ঞান থেকে বাল্য কৈশোরের পাঠোপযুক্ত কাহিনীসমেত বিষয়বস্তু স্বচ্ছন্দ বাংলায় পড়বার উপায় প্রদর্শন করলেন। তার মধ্যে ছিল 'কথামালা'র নীতিগল্প, 'চরিতাবলী'তে দরিদ্র অবস্থা থেকে শিক্ষোন্নত কৃতী মানুষদের আদর্শনীয় জীবনী, আর 'বোধোদয়ে' চারপাশের জগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অবলোকনের সূত্রপাত।

পরাধীন ঔপনিবেশিক মনের সংগঠনে ইংরেজি শিক্ষার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সেদিনের পক্ষে যে জ্ঞান প্রয়োজন, ইংরেজি ভাষা ছাড়া তা অর্জন করা সম্ভব নয়, মেকলের শিক্ষানীতি ওই প্রাথমিক প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তেমন শিক্ষার গুণে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উপযুক্ত জ্ঞান, বুদ্ধি এবং নৈতিকতার অধিকারী হতে পারে। উড-এর প্রতিবেদনে ব্রিটেনের ধনতন্ত্র এবং ভারতে ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে ফলপ্রসূ সম্পর্কের কথাও প্রাধান্য পেয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষণে নাকি ভারতের বাস্তবিক উন্নতি হবে। মোদ্দা ব্যাপার হলো ব্রিটেনে কাঁচামালের যোগান এবং তার শিল্পদ্রব্যের বাজার বেড়ে যাবে। উড-এর কথা ছিল পুঁজি এবং শ্রমের প্রয়োগে যে আশ্চর্য উন্নতি তার প্রেরণায় বাণিজ্য ও সম্পদের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।

সাম্রাজ্যের এমন প্রকল্প প্রতিপদে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে তার প্রভুত্বের বশীভূত করতে প্রয়াসী। এই প্রয়াসের বিরুদ্ধতা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিকোণে ছিল না। সেদিনের ইতিহাস, বিদ্যাসাগরের নিজের পটভূমি, দরিদ্র ভদ্রলোকের অবস্থা থেকে অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের শিখরে তাঁর উত্তরণ, আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সৌহার্দ্য—এসব কোনো অভিজ্ঞতাই বিদ্যাসাগরকে সেরকম বিরুদ্ধতায় অনুপ্রাণিত করেনি। রাজার কর্মনীতির অনুকূল সংস্কারেই তিনি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও মৌলিকত্বের প্রয়োগে সচেষ্ট ছিলেন। সেখানে স্ববিরোধ দেখা দিত। বিকল্পের হদিস মেলেনি। জেলায় জেলায় প্রাথমিক বাংলা স্কুল স্থাপনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ বারবার সরকারি বাধানিষেধের সম্মুখীন হয়েছে। আর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রশ্নে গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে তাঁর মতভেদ তো বিদ্যাসাগরের সরকারি কাজ থেকে অবসর নেওয়ার অন্যতম কারণ।

চাকরি এবং অন্য কিছু বৃত্তিতে নিয়োগের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে তেমন বিদ্যার্জনের তাগিদ দ্রুত বাড়তে থাকে। প্রথমে সুযোগ পেল মহানগরের উচ্চ মধ্যবিত্ত। তারপর শতাব্দী ব্যেপে তা বিস্তৃত হয় মধ্যবিত্তের সব স্তরে। ১৮৬১-৬২তে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি রিপোর্ট উল্লেখ করছে যে সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করতেও রাজি ভদ্রলোক সম্প্রদায়। (Sen 1977 : 36) যেসব কাজের আগ্রহে এই শিক্ষার এমন চাহিদা তার সঙ্গে উৎপাদনে উন্নতির কোনো সংযোগ ছিল না। দেশজ শিল্পের বিনাশ এবং পরজীবী মধ্যস্বত্বে আকীর্ণ ভূসম্পত্তিতে চিহ্নিত সেই অর্থনীতি। আবার বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের বড় একটা উদ্যোগ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের থাকেনি। ওপর তলায় শিক্ষার প্রসার চুইয়ে চুইয়ে নিচের তলায় পৌঁছবে (downward filtration) এমন ধারণার বাস্তব নজির ছিল না বললেই চলে। বেকনের যুক্তিনির্ভর জগচ্চিত্রের আকর্ষণ যাই থাক, তার গোড়াকার উৎপাদনমুখী প্রত্যক্ষদর্শী বাস্তবতার ভিত্তি এখানে তৈরি হলো না।

শিক্ষার জন্য মোট আর্থিক ব্যয়ের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলের বরাদ্দের অনুপাত কম ছিল বাংলায়। এখানে তুলনার জায়গা বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ। ১৮৬৬-৬৭তে অবস্থার একটি সরকারি বিবরণ।

> শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক বৈষম্যে চিহ্নিত বাংলা প্রদেশ। একদিকে অনেকটা সরকারি ব্যয়ের দৌলতে অল্পসংখ্যক ছাত্র পাশ্চাত্য ভাষা এবং দর্শনে শিক্ষা পাচ্ছে, আর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জনের উপযুক্ত বিদ্যার্জনে অভিলাষী; অন্যপক্ষে জনশিক্ষার কাজে নিযুক্ত বিদ্যালয় সরকারি সাহায্য পায় না এবং সেখানে ছাত্রদের ধুলোর ওপর আঁচড় কেটে অক্ষর চিনতে হয়…(Howell 1868 : 60)

বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়ম গ্রের আমলে ভারত সরকারের কাছে আর্জি গেল যেন ইংরেজি শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকদের আতঙ্ক না বাড়ান হয়। কৃষ্ণনগর, বহরমপুর এবং সংস্কৃত কলেজের জন্য খরচ কমান স্যার জর্জ ক্যাম্বেল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় ভদ্রসমাজে। টাউন হলের বিরাট মিটিঙে (জুন, ১৮৭০) গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। চব্বিশ পরগনার ইংরেজ জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সভায় যান। তাঁর বক্তব্য 'সেই উচ্চশিক্ষা থেকে আমাদের প্রাপ্তি কিছু কম নয়। তার অবদান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বাক্‌পটু উকিল। ইওরোপের সব দেশে আমি গিয়েছি। বাংলার মতো ইংরেজির প্রতি ভালবাসা আর কোনো দেশে নেই।' (Sen 1977 : 37) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৯)-এর রিপোর্টে ছিল যে ১৮৮২ থেকে ১৯০২ সময়কালে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে আরও প্রাথমিক স্তরের কোনো সমতা ছিল না। নিছক ইংরেজি শিক্ষা নয়, যে ইংরেজি শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্বের প্রস্তুতি সেদিকে সবচেয়ে বেশি ঝোঁক পড়েছিল। (Sen 1977 : 43)

সরকারি বিদ্যালয়ে মাইনে বেশি। বৃত্তি না পেলে সেখানে পড়া গরিব মধ্যবিত্তের সাধ্যাতীত। মিশনারি স্কুলে মাইনে কম হলেও ম্লেচ্ছ প্রভাবের আশঙ্কা ছিল। দেশীয় উদ্যোগে বেশ কিছু অ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে ইংরেজির সঙ্গে বাংলাও পড়ান হতো। উল্লেখযোগ্য যে সপ্তগ্রাম স্বুবর্ণ-বণিকদের মতো ব্যবসায়ী জাতি এমন বিদ্যালয়ের সূচনায় প্রচুর উৎসাহ এবং সমর্থন প্রদান করেন। (John McGuire 1983 : 45) অন্যান্য কারণের মধ্যে তাঁদের নিজেদের কাজকর্মেও ইংরেজি জানা কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় সাহেবদের সঙ্গে দেনা-পাওনায় অসুবিধা দেখা দেয়।

আবার বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের পর কালেজিয় শিক্ষায় মেট্রোপলিটান কলেজের কথা আগে লিখেছি। সেখানে স্বল্প বেতনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার উত্তম পরিচালনা বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট কীর্তি। তবে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন স্বদেশের ক্ষেত্রে ইংরেজি বিদ্যার বদ্ধমূল রোপণ, তার ফলাফল বিচারে বিদ্যাসাগরের কাজের সীমানাও আমরা দেখতে পাই।

সমাজের পরিব্যাপ্ত ভালমন্দ মিলিয়েই তেমন বদ্ধমূল রোপণের তাৎপর্য। সেখানে ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। সরকারি প্রতিবেদন এবং পত্রপত্রিকার সমাজচিত্রে আমরা তার চেহারা দেখতে পাই। ১৮৮৪-র একটি কমিশনের কার্যবিবরণীতে নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার ধরনধারণ শিক্ষিতদের কায়িক শ্রমের কাজে বিরত করে। যে শ্রেণীর বুদ্ধি ও শ্রমে দেশের সমৃদ্ধি সেখানে তাদের পাত্তা নেই। তখন নিছক বুদ্ধিজীবী কাজকর্মের জন্য দেখা দেয় কঠোর প্রতিযোগিতা। তেমন কাজের জন্য হাজার হাজার প্রতিযোগী। তার ক্ষেত্র বড় হলেও আর জায়গা নেই। শিল্পে কাজ করবার উপযুক্ত শিক্ষণ অবহেলিত হয়েছে, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তো কোনো শিক্ষাই পায়নি। (James Johnston 1884 : 45)

১৮৮২তে শিক্ষা কমিশনের কাছে বাংলার স্মারকলিপিতে প্রায়োগিক শিক্ষার কথায় জোর পড়ে। (Sen 1977 : 44) ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে কিন্তু প্রায়োগিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদাও বড় একটা বাড়ে না। শিল্প ও কৃষির প্রায় নিশ্চল অবস্থায় তা স্বাভাবিক। সমাজ অর্থনীতির গভীরে দুর্মর যে সব অসঙ্গতি, তার প্রতিকার তো কেবল শিক্ষানীতির অদল বদলে হতে পারে না। ১৮৮৬তে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হচ্ছে,

> অর্থের সংস্থান যে মূলধন ধরিয়া বাণিজ্য অথবা শিল্পের উন্নতি করিবেন তাহা নহে।…সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষার্থিগণ কোনও উন্নতির প্রত্যাশা করিতে পারে না, চিকিৎসা বিভাগে প্রকৃতপক্ষে আর একজনের স্থান হয় না, …যাঁহারা বহুল অর্থ শ্রাদ্ধ করিয়া সিরেণ-সেস্টার কলেজ হইতে কৃষি বিদ্যায় উপাধি লাভ করিয়া আসিলেন, তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় পর্যন্ত হইয়া উঠিতেছে না। (বিনয় ঘোষ স. ১৯৬৬ : ৩৪৯-৫০)

আশ্চর্য নয় যে ১৯১৯-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে আমরা জানছি যে যন্ত্রবিদ্যা ও খনিজ বিদ্যায় স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষণের প্রস্তাব তখনও কার্যকর হয়নি। একই কমিশনে ভূমিসংক্রান্ত নথিপত্র এবং কৃষির সরকারি অধিকর্তা প্রস্তাব করেন যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এমনভাবে পুনর্গঠন প্রয়োজন যাতে জমিদারি হিসেব, তত্ত্বাবধান, জমির পরিমাপ ও সমীক্ষা, পশু চিকিৎসা এবং হিসাব বিদ্যার শিক্ষণ সম্ভব হয়। চাহিদার অভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার গুরুত্ব কমাতে এই প্রস্তাব। (Sen 1977 : 47) গত শতাব্দীর শেষ দু-তিন দশকে 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী' এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকায় বাঙালি মধ্যবিত্তের সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির অনেক পরিচয় আছে। এমন পটভূমিতে তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানের সূচনা, আবার আমাদের জাতীয়তাবাদের আরম্ভ।

একটি নক্সাজাতীয় লেখায় ইন্দ্র, বরুণ, নারায়ণ এবং ব্রহ্মা মর্ত ভ্রমণে এলেন। ব্রহ্মার উক্তিতে আমরা বাঙালির কথা পড়ছি,

কি আশ্চর্য্য ! যাহাকে দেখি, যাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি, সেই কেরাণী। দোকানদার, মহাজন, অধ্যাপক, চিকিৎসক, চামার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার আর চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না সকলেই কেরাণী। বরুণ ! পরাধীন জাতির পরাধীন থাকিতে এত সাধ ? দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, দেশের শিল্পশাস্ত্রের বিলোপ হইতেছে, যাহারা দেখিয়াও দেখে না, তাহাদের মত বোকা জাতি কি দুনিয়ায় আছে ? (দুর্গাচরণ রায় ১৯৮৪ : ৪৮৪)

নক্সার উক্তিতে আক্ষরিক সত্য যাচাই করা নিষ্প্রয়োজন। তবে জীবিকার গৌণতায় আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের অবস্থা নিশ্চয় বোঝা যায়। এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রতিক্রিয়া আমরা সরাসরি জানতে পাই না। তবে শিক্ষার বেবন্দোবস্তে, তার অনেকটা নিষ্ফলতায় বিদ্যাসাগর নিশ্চয় বিচলিত হতেন। তাই সম্ভবত তিক্ত রসিকতার মেজাজে একবার বলেছিলেন, 'আমরা সেই ঘাট মাঝির মত টঙ বাঁধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের কাছ থেকে নানা রকম ফি আদায় করিয়া বলি—ঐ স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাস্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনিয়া পড়োগে। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়া যাইও' (সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ স. ১৯৮৯ : ৭০১)

শিক্ষার বিস্তার এবং উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার নির্মাণকে জীবনভর এক বড় কর্তব্য মনে করতেন বিদ্যাসাগর। সেদিনের নৃপতির প্রতি আস্থা নিয়ে তাঁর শিক্ষানীতির শুরু এবং শেষ। তেমন আস্থায় অবশ্য কোনো অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় নেই। রসময় দত্ত বা গর্ডন ইয়ং কারও কাছেই বিদ্যাসাগর নতি স্বীকার করেননি। তবে যে রাজত্বের তিনি পণ্ডিত তার ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব কোনো সৎ পরামর্শে খর্ব হবে না। শিক্ষার যোগান কিংবা চাহিদা, কোনো দিকেই সেই জটিল বাস্তব থেকে অব্যাহতি নেই। যে যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানের প্রেরণায় ইংরেজি জ্ঞানকে অপরিহার্য লাগে, দেশব্যাপী শাসন ও শোষণের বিধিব্যবস্থা তো তার অগণিত মুখোশের অন্তরালে আপন স্বার্থ নির্বাহ করে যায়।

মার্জিত, স্নললিত বাংলা গদ্যের নির্মাণ বিদ্যাসাগরের অসামান্য কীর্তি। শিক্ষানীতির জটিলতা ও অসঙ্গতির কথা যতই বলি না কেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি শিশু সাদাসিধে চটি কয়েকটি বইতে অজগর, আনারস, ইঁদুর, ঈগল, উট-এর প্রথম রোমাঞ্চে, 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' মিলিত ধ্বনি ব্যঞ্জনায় বা 'দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ'-এর তির্যক ইচ্ছাপূরণে মুগ্ধ হয়ে এসেছে। তাই অনাহত শৈশব

স্মৃতির অনুরণনে বিদ্যাসাগর বারবার আমাদের শিক্ষাচিন্তার অগ্রগণ্য মনীষী, অনেকটা যেন উপকথার এক রহস্যাবৃত চরিত্র।

সমাজসংস্কার : অর্জন ও অপচয়

১৮৫৬তে বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হলো। এই ব্যবস্থার অনুকূলে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়, প্রাসঙ্গিক তর্কবিতর্কে এবং আন্দোলনে বিদ্যাসাগর অগ্রণী ছিলেন। আইন মাফিক বিধবাবিবাহ প্রচলনেও তাঁর উদ্যোগের অন্ত ছিল না। সেক্ষেত্রে অবশ্য বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ব্যর্থতায় আকীর্ণ। তবে নিজের সংকল্পে অবিচলিত ছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭০ সালের নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগর পরিপূর্ণ সম্মতি দেন। সেজভাই শম্ভুচরণকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগরের অভিমত জানা যায়।

…নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে। আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৯৯২ : ১৫১-৫২)

এ ব্যাপারে আত্মীয় কুটুম্বদের অসহযোগিতার আশঙ্কাতে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র সংকুচিত হননি। পূর্বোক্ত চিঠিতেই তিনি লেখেন '…নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ

বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা, কাহারও উচিত নহে।' (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৯৯২ : ১৫২)

বিধবাবিবাহের ঔচিত্য প্রমাণে বিদ্যাসাগর ধর্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞাকে প্রাথমিক প্রয়োজন মানেন। নারায়ণচন্দ্রের বিয়েতে আত্মীয়কুটুম্বের বিরুদ্ধতা তো নিছক দেশাচারের ব্যাপার। দেশাচারের বিরুদ্ধতায় যথার্থ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা খর্ব করা অসঙ্গত। বিদ্যাসাগরের তাই মত। তখন যে যাই বলুক, ব্যক্তিবিশেষের 'স্বতন্ত্রেচ্ছ' হওয়ায় তিনি জোর দেন।

১৮৫০-এ 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের রচনা 'বাল্যবিবাহের দোষ'। সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে এটাই তাঁর প্রথম নিবন্ধ। এখানে শাস্ত্রবাক্যের তোয়াক্কা করেননি বিদ্যাসাগর। তাঁর কথায় '…স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যমাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন…লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহার পাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বাল্যবিবাহ নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি।' (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ. : ৫)

পাঁচ বছর পরে ১৮৫৫তে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে দুটি বই প্রকাশ করেন বিদ্যাসাগর। প্রথম বইটি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় অনুমোদনে চিহ্নিত। পরাশর সূত্র অনুসরণে দেখা যাচ্ছে যে সহমরণ অথবা ব্রহ্মচারিণী জীবন বিধবার পক্ষে পুণ্যকর্ম। সহমরণে সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গবাস। তার ওপর অবশ্য সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ব্রহ্মচারিণী বিধবাও স্বর্গে যাবে। তবে পরাশর সংহিতায় এই সূত্রও আছে যে 'স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।' পরাশর সংহিতাই কলিযুগে প্রযোজ্য। বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যা করলেন যে কলিযুগে ব্রহ্মচর্য পালন নিতান্তই দুষ্কর। তাই পরাশর বচনে পুনর্বিবাহের বিধান বিধবাদের পক্ষে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা।

বিধবাবিবাহের অনুমতিসূচক একটি আইন বিধিবদ্ধ করতে চান বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রথম বইটি বেরুলে হিন্দুসমাজ ও পণ্ডিতমহলের বহু প্রতিবাদ এবং বিরোধী মতামত প্রকাশ পেল। যে সব সূত্র ধরে প্রতিবাদ ও সমালোচনা হয়েছিল, দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর তেমন সব প্রমাণ খণ্ডন করেন এবং নিজের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পক্ষে বিস্তারিত শাস্ত্রীয় যুক্তি তুলে ধরেন। বাদপ্রতিবাদ, আন্দোলন

আলোড়নে আকীর্ণ সেই পরিস্থিতি এবং পক্ষেবিপক্ষে সরকারের কাছে অনেক স্বাক্ষর সংবলিত আবেদন পেশ হতে থাকে। ১৮৫৬তে হিন্দুদের বিধবাবিবাহ অনুমোদন করে ব্যবস্থা পরিষদে আইন প্রণীত হলো।

'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে তো বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় বিধানের সমালোচক ছিলেন। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিধবাবিবাহ অনুমোদনের জন্য কেন তিনি বেশি শাস্ত্রীয় প্রমাণে নির্ভর করছেন। শাস্ত্রীয় বিধানে নিহিত থাকে বহুজনের আস্থা। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের পক্ষে ধর্মশাস্ত্রের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের প্রধান লক্ষ্য। সেই স্তরের আস্থা সম্মতি ভিন্ন তাঁর আরব্ধ সংস্কারের প্রস্তাব কার্যকর হবে না। তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ শাস্ত্রবিচারেই বিধবাবিবাহের বিধান খোঁজেন বিদ্যাসাগর।

আবার ধর্মশাস্ত্র এবং ইংরেজের 'কমন ল'-এর সংমিশ্রণে নির্মিত ঔপনিবেশিক হিন্দু আইন ব্যবস্থা। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকেই তার আরম্ভ। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা আলাদা। সে সব ব্যাপারে যার যার নিজস্ব ধর্মীয় আচার আর তার সূত্র অনুসারেই হবে আইন বিধি। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলমানের শরিয়ত তার অবলম্বন। তার সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে ইংরেজদের 'কমন ল' তথা সার্বজনিক আইনের সমগ্র একতিয়ার। ধর্মশাস্ত্র বা শরিয়তের যে প্রভাবই থাকুক, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে, জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের নিজনিজ গণ্ডিতে তাদের প্রথামতো লোকাচারের যে বিধান ছিল, 'কমন ল'তে তার স্বতন্ত্র একতিয়ার ভাঙনের মুখে পড়ে।

এমন ব্যবস্থায় যাকে বলতে পারি ইঙ্গ-হিন্দু আইন তাতে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন ধর্মশাস্ত্রের অনুকূল ব্যাখ্যা ভিন্ন সম্ভব নয়। তাই রাজার আজ্ঞা এবং প্রজার সমর্থন উভয় উদ্দেশ্যই বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রবিচারে নিহিত। উল্লেখযোগ্য যে বিধবাবিবাহ আইনের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ইংরেজ সরকার শাস্ত্রীয় প্রমাণের ঠিক-বেঠিক নিয়ে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি। বিধবাবিবাহ ব্যক্তিগত বিচার ও অভিমতের ব্যাপার। বিধবাবিবাহ আইনসম্মত এবং তেমন বিবাহের সন্তান বৈধ—এই হলো নতুন আইনের সারকথা। আগে বিধবাবিবাহ বেআইনী ছিল। অনুমতির ক্ষেত্র প্রসারিত হলেও, বিধবাবিবাহ আইনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যপক্ষে বহুবিবাহ নিষেধ মানে তো একটা নিবারণের ব্যবস্থা যার থেকে

বিচ্যুতির সঙ্গে দণ্ডের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সে ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ, অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো আইন প্রণীত হয়নি।

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার সময় 'ইয়ং বেঙ্গল' পন্থীরা একটি আবেদন করেন। তাঁদের আর্জি ছিল যাতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আইনত রেজিস্ট্রিকরণেও বিধবাবিবাহ বৈধ গণ্য হয়। এই অনুরোধ মঞ্জুর হয়নি। কমিটির মতে তেমন অনুমোদনে গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মবোধ আঘাত পাবে এবং তার ফলে প্রস্তাবিত আইনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। (Sen 1977 : 57) .

হিন্দু আচারবিধি অনুযায়ী পূর্ণ সমারোহ সহকারে বিধবাবিবাহের আয়োজন করতেন বিদ্যাসাগর। সালঙ্করা কন্যা সম্প্রদান তার অপরিহার্য অঙ্গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিয়ের ব্যয়ভার বহন করতেন বিদ্যাসাগর। পরিচিত অনেকেই প্রতিশ্রুত সাহায্য দেননি। পুঞ্জীভূত হয় বিদ্যাসাগরের ঋণের বোঝা। দুর্বিষহ সেই অভিজ্ঞতা। দুটি চিঠি থেকে কিছু নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। একটিতে বিধবাবিবাহে ব্যয়হ্রাসের প্রয়োজন জানিয়ে সেজভাই শম্ভুচরণকে লিখছেন বিদ্যাসাগর,

> অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি কিছুই খরচ করিব না স্থির করিয়াছি অতএব কৃষ্ণনগরের কন্যার মাতাকে স্পষ্ট বাক্য বলিবে আমি কেবল পাত্র স্থির করিয়া দিব পাত্র খরচ করিয়া বিবাহ করিবেন এবং আপন সঙ্গতি অনুরূপ অলঙ্কার দিবেন যদি ইহাতে সম্মত থাকেন তবেই তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে পাঠাইবে নতুবা প্রয়োজন নাই। একথা লিখিবার অভিপ্রায় এই যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে কলিকাতায় যে কন্যার বিবাহ হয় সে অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার পায় যদি তাঁহারও সে সংস্কার থাকে তবে সেই সংস্কার অনুযায়ী অলঙ্কার তাঁহার কন্যা না পাইলে তিনি নিঃসন্দেহে দুঃখিত হইবেন। এজন্য অগ্রে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া থাকা উচিত। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৪৬৪)

অন্য চিঠিটি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা। তাতে আশু ঋণ শোধের অক্ষমতা জানাচ্ছেন বিদ্যাসাগর,

> আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম, কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবা-

বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ-ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি ; সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না ; কেহ মাসিক কেহ এককালীন, কেহ-বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ হেতু দেখাইয়া, কেহ বা তাহা না করিয়াও, দিতেছে না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্য দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধ মাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্য্যন্ত দাও নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। ...যাহা হউক, আমি এই ঋণ-পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না, এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৪৮১-৮২)।

নানাবিধ ঘটনাচক্রে সংশ্লিষ্ট এসব চিঠি। তবে তাদের বয়ান থেকে স্পষ্ট যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর কী কঠিন বাধা এবং ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন তো বিদ্যাসাগরের মূল লক্ষ্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক অস্তিত্বে কিন্তু তেমন সমাজ সংস্কারের সাধ বা সাধ্য চারিয়ে যায় না। সামাজিক উৎপাদনে কোনো অগ্রণী ভূমিকা সে শ্রেণীর ছিল না। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শিক্ষার অসঙ্গতিও প্রচুর। এমন গৌণতা, অসঙ্গতি সমাজ সংস্কারের অনুকূল নয়।

'ইয়ংবেঙ্গল'-এর পাশ্চাত্যপন্থী যুক্তি বিদ্যাসাগর প্রয়োগ করেননি। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা তাঁর প্রমাণে নেই। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিস্তারিত বিচারে সনাতন রীতিনীতির আঙ্গিকে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দিলেন বিদ্যাসাগর। তবে দেশাচারের বিরুদ্ধতায় বিদ্যাসাগর অনেক বিরূপ, তিক্ত অভিজ্ঞতায় পর্যুদস্ত

হন। তখন তিনি লেখেন, 'যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক-রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম-গ্রহণ না করে।' (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ. : ১৬৫) বিদ্যাসাগরের মর্মে মর্মে নিহিত সেই স্বীকারোক্তি যে তিনি 'স্ত্রী-জাতির পক্ষপাতী'। সেখানে জড়িয়ে আছে নিজের বাল্যকালে কলকাতায় জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে তাঁর বিধবা বোন রাইমণির 'স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি' সদ্‌গুণের অমূল্য, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ গ : ৪২১-২২)

বিধবাবিবাহ হক বা না হক, তার সঙ্গে সাংসারিক শ্রমবিভাগে মেয়ে-পুরুষের অবস্থার কোনো পরিবর্ত নেই। হিন্দুর সাংসারিক গড়নে বাদবিচার মেনে ব্রহ্মচারিণী বিধবার কাজ গৃহকর্ম। বিয়ে হলে বিধবা তো আবার এক সংসারে গৃহিণী হন। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক, উদ্যোক্তা ছিলেন বিদ্যাসাগর। তখন তার সঙ্গে মেয়েদের জীবিকার কথা ওঠেনি। মহিলা নর্মাল স্কুলে বিধবা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণের যে প্রস্তাব মেরি কারপেণ্টার করেছিলেন, তা বিদ্যাসাগরের সমর্থন পায়নি। তখনকার ভদ্রলোক সমাজে বিবাহই ছিল বাড়ন্ত মেয়েদের জীবনে একমাত্র লক্ষ্য। তার আবার অপরিহার্য অঙ্গ পণ ও যৌতুক। রিসলির বিবরণে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকদের কথা আছে। তাঁদের কথায়, এমনিতেই উপযুক্ত জাতকুলে অনূঢ়া কন্যাদের বিবাহ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। পাত্রীর যোগানে বিধবাদের প্রবেশ ঘটলে সমস্যা আরও কঠিন হবে। (H. H. Risley 1891 : LXXVII-LXXVIII)

সমাজ সংস্কারের ধারণায় হিন্দুদের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত উঁচুনিচু সমাজের গড়নে যে ভাবনীতির (ideology) প্রত্যয়, বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে যাননি। 'অবলাদের' সম্পর্কে অপার করুণায় ছিল তাঁর সমাজসংস্কারের প্রেরণা। তবে বিধবাবিবাহ অনুমোদন এবং বহুবিবাহ নিবারণ উভয় প্রস্তাবেই নারীর ইচ্ছা ও কর্মের ওপর পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অটুট ছিল। ব্যভিচার ভ্রূণহত্যার আশঙ্কা উপেক্ষণীয় নয়। তবে বিধবার ব্রহ্মচর্য আঁকড়ে থাকে অজস্র সব বিধি-নিষেধ। বিয়ে না হলে সেই কঠোর অমানুষিক নিয়মের রাজত্ব থেকে বিধবার অব্যাহতির কথা বলেননি বিদ্যাসাগর। ধর্মশাস্ত্রের সীমায় সম্ভবত তা বলার নয়। নিজের কন্যার অকাল বৈধব্যের পর শোকসন্তপ্ত বিদ্যাসাগর কিছুদিন নিরামিষাশী ছিলেন। তবে পুনর্বিবাহ না হলে জীবন্ত বিধবা নারীর একমাত্র কর্তব্য মৃত

পুরুষের বশ্যতা। আর তেমন বশ্যতার স্বীকৃতি খাওয়াপরা থেকে জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটিতে পরিব্যাপ্ত। পুরুষের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রয়োগ নেই। তাই পুরুষ-তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের শক্তি অবশ্যস্বীকার্য।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে বিধবাবিবাহের অনুমোদন ছিল বিদ্যাসাগরের প্রধান উদ্দেশ্য। উচ্চ এবং মধ্য বর্ণের পরম্পরাতেই কিন্তু তার কঠোর বিরুদ্ধতা। কোনো কোনো মধ্যবর্তী বর্ণে আবার বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করা একরকম বর্ণাভিজাত্যের ব্যাপার হয়ে পড়ে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন যে সনাতন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধতায় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। (Bandyopadhyay 1995 : 9) অন্যদিকে নিম্নতম তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' বর্ণের ক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। ১৮৫৬-র আইনের একতিয়ার তো পুরো ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে সেখানে মোট হিন্দুর মধ্যে নিচুতলার শূদ্রবর্ণের লোক আশি শতাংশ এবং তাদের লোকাচারে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। (Lucy Carroll 1983 : 364) এরকম পরিসংখ্যানের কথা গোপাল হালদারের আলোচনাতেও আছে। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ : উনত্রিশ) অনেক ক্ষেত্রেই সেসব স্তরে বিবাহিতা বিধবা পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারচ্যুত হতেন না। ১৮৫৬র আইনে আবার বিবাহিতা বিধবা পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হারাবেন। ফলে ১৮৫৬র আইন এবং নিম্ন বর্ণের মধ্যে প্রচলিত লোকাচারে অসঙ্গতি দেখা দিল। এলাহাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলকাতার নিম্ন ও উচ্চ আদালতে অনেক মামলায় সেরকম ভেদাভেদের নজির পাওয়া যায়। (Lucy Carroll 1983 : 367-87) দেশাচারের বিচারে বিদ্যাসাগরের সমস্যা উচ্চবর্ণের চৌহদ্দিতে নিবদ্ধ থাকে। নিচের তলার আশি শতাংশের ক্ষেত্রে বিধবাবিবাহের অনুকূল দেশাচারের দৃষ্টান্ত বর্তমান ছিল।

হিন্দু বিধবার বিয়েতে প্রচলিত সংস্কার এবং ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান পালন করবার পক্ষপাতী ছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৬র আইনে নিছক রেজিস্ট্রিকৃত হিন্দু বিবাহের অনুমোদন না থাকার কথা আগে বলেছি। ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রথম বিধবাবিবাহ করেন গুরুচরণ মহলানবীশ। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজে নেতৃবৃন্দের দ্বিধা থাকায় বিদ্যাসাগর নিজের উদ্যোগে গুরুচরণের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু তাঁর শর্ত বিয়ে হবে হিন্দুমতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্রাহ্মদের আয়োজনেই গুরুচরণের বিবাহ সম্পন্ন হয়। (Sen 1977 : 61)

হিন্দু আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে দায়বদ্ধতায় কম বিড়ম্বিত হননি বিদ্যাসাগর। পণ যৌতুক নিয়ে বিধবা বিয়ে করার পর অনেকে বেপাত্তা হয়ে যেত। আবার লোভের বশে বিধবাবিবাহের সংস্রবে বহুবিবাহ করবার পাত্রও দেখা গিয়েছিল। অন্যপক্ষে ১৮৬০-৭০এর দশকে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মদের আন্দোলন আর এক ধরনের বিধবাবিবাহে উদ্যোগী হয়েছিল। এসব বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দু পৌত্তলিকতা বর্জিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অমত ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিয়ে হয়েছিল। ১৮৭২এ 'সিভিল ম্যারেজ' (তিন আইন) বিধি প্রণয়নে ওই তরুণ ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়।

উপরিউক্ত আইনে বিবাহেচ্ছু পাত্রপাত্রীদের কবুল করতে হতো যে প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মের বৈবাহিক নিয়মে তারা অনুগত নয়। এই আবশ্যকতাকেই সম্ভবত বিদ্যাসাগর বলেন 'কিম্ভূতকিমাকার' এবং তা বাদ দিয়ে হিন্দুর বিধবাবিবাহতে ওই আইনের সুযোগ পেতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কারণ, 'তাহা হইলে আমি অনেক প্রবঞ্চনার হাত হ'তে নিস্তার পাই।' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯৪ ব : ২৫৭-৫৮) গোঁড়া হিন্দুদের মনস্তুষ্টির জন্য ১৮৫৬-র আইন প্রণেতারা রেজিস্ট্রি-কৃত বিবাহে আপত্তি করেন। তারপর দু-দশক ব্যাপী অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং প্রবঞ্চনায় জর্জরিত বিদ্যাসাগর 'তিন আইনের' কিম্ভূতকিমাকার ভাবের পরিবর্তনে নিস্তার চান। এমন ঘটনাচক্রে জটিল এক অভিজ্ঞতার প্রকাশ অবশ্য-স্বীকার্য!

কোনো পরিবর্তিত তিন আইনের সুযোগ বিদ্যাসাগর পাননি। চারজন সাক্ষীর স্বাক্ষর সংবলিত এক টাকার স্ট্যাম্প কাগজে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের অছিলায় প্রবঞ্চনা রোধে সচেষ্ট হন। অঙ্গীকার পত্রের বয়ান হতো, 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত আইন-সঙ্গত কর্ম জানিয়া আমি স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, অদ্যাবধি আমরা পরস্পর দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম। অর্থাৎ তুমি আমার পত্নী হইলে আমি তোমার পতি হইলাম, আমি ধর্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি প্রকৃতরূপে পতিধর্ম পালন করিব, অর্থাৎ তোমার যাবজ্জীবন সাধ্যানুসারে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব। তোমার প্রতি কখনও অযত্ন বা অনাদর প্রদর্শন করিব না, আর ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি, যে তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ করিব না : যদি দুর্বুদ্ধির অধীন বা অন্যদীয় অসৎ পরামর্শের বশবর্তী হইয়া অথবা অন্য কোনো কারণবশতঃ তোমার জীবদ্দশায় ভার্যান্তর পরিগ্রহ করি, তাহা হইলে তোমাকে আধিবেদনিক স্বরূপ এক সহস্র

টাকা দিব। আর যদি আমি পুনরায় বিবাহ করাতে তুমি অসন্তুষ্ট বা অন্যবিধ অন্যায় আচরণ দর্শনে বিরক্ত হইয়া আমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে। তোমার গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতি মাসের আরম্ভে ১০ টাকা করিয়া দিব। ...আমি অবর্তমানে তুমি ও তোমার পুত্র কন্যারা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে আমার পৈতৃক ও স্বার্জিত যাবতীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আর যদি আমি তোমাকে বা তোমার পুত্র কন্যাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনিয়োগ পত্রাদির দ্বারায় আমার বিষয়ের অন্য কোনো ব্যবস্থা করি, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্বক, সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে একরার-পত্র লিখিয়া দিলাম।' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯৪ ব. : ২৫৬-৫৭)

১৮৬৭ সালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় একটি আবেদন বেরয়। মান্যগণ্য ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত এই আবেদনে বিদ্যাসাগরের ঋণশোধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এর কথা বিদ্যাসাগর জানতেন না। জানামাত্র তিনি প্রতিবাদ করেন। হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত চিঠিতে বিদ্যাসাগর দর্শালেন যে কেন ষাটটি বিধবা বিয়েতে ৮২০০০ টাকা ধার হয়েছে। যৌতুকাদির ব্যয় তো ছিলই। তদুপরি দলবদ্ধ প্রতিরোধ, জমিদারের জুলুম ইত্যাদি নানারকম বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হতো এবং তার আনুষঙ্গিক জনবল, মামলা, মোকদ্দমায় প্রচুর খরচ হতো। বিদ্যাসাগর লেখেন, 'যাঁহারা এই চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বিধবা-বিবাহ ফণ্ড খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আমার এই ঋণের কথা না পাড়িতেন, তাহা হইলে আমি প্রতিবাদ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতাম না। ...আমি যাহা ঋণ করিয়াছি, তাহা শোধ করিবার জন্য সাধারণ সমীপে আবেদন করিবার ইচ্ছা আমার লেশমাত্রও নাই।' (বিহারীলাল সরকার ১৩৮৮ ব. : ২৭৫) চিঠিতে বিদ্যাসাগরের শেষ কথা একটি জাতীয় উদ্দেশ্য (national object) সাধন ছিল তাঁর অভিপ্রায়, কিন্তু সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ঋণের দায় এত জড়ানো হয়েছে যে ওই আবেদনে তাঁর ঘোর আপত্তি। সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোকদের আবেদন প্রত্যাহার করতে বলেন বিদ্যাসাগর।

শত দুর্বিপাকেও বিদ্যাসাগর 'জাতীয়' কর্তব্যে অটল, নিজের সমস্যায় আত্মনির্ভর। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে তাঁর সাফল্য বেশি নয়। নতুন আইন মাফিক বিয়ের সংখ্যা কমই ছিল। শাস্ত্রানুগ হিন্দু বিধানের চৌহদ্দিতে সে প্রস্তাবের

স্ববিরোধ ছিল। শাস্ত্রই যদি মানতে হয় তবে তো সহমরণ এবং ব্রহ্মচর্য পুণ্যকর্ম। বিধবাবিবাহ নেহাতই যেন ব্রহ্মচর্যে অক্ষমদের বিধান। তবে তেমন সীমার মধ্যে বিদ্যাসাগরের সংকল্পে কোনো অভাব নেই। অপরের দুঃখ নিবারণের প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর নিজের শত কষ্টকেও পাত্তা দেন না। সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত, অপ্রতিরোধ্য তাঁর পরহিতের আগ্রহ। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় তেমন আগ্রহ একটা ব্যাপক সামাজিক প্রেরণা অর্জন করে। তবে সেখানে নিজের পটভূমির উর্ধ্বে উঠতে চাইলেও বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের বন্ধন পেরিয়ে যান না। নিম্নবর্ণীয় লোকাচারের আকর্ষণ তাঁর নেই। যেমন সমাজে নেই এমন কোনো শ্রেণীর প্রাধান্য যা বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যাকে তার সীমার বাইরে প্রয়োগ করতে পারে। সম্ভবত নিজের ক্ষেত্র কর্মে এসব বিদ্যাসাগরের পক্ষে অনিবার্য। তবু সংকল্পের দৃঢ়তায়, তাঁর নির্ভীক নিরলস প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর বাঙালি মধ্যবিত্ত গৌণতায় অনিরুদ্ধ এক ব্যক্তিস্বরূপের সন্ধান দেন।

যৌক্তিক-অযৌক্তিকের উভটান

উনিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ঐতিহাসিক পরম্পরাতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যাসাগরের জীবন। অবশ্য কীর্তি আর গৌরবের ব্যঞ্জনায় তাঁর জীবনের আবেদন সমকালকে পেরিয়ে প্রায় একটি বিগ্রহের স্থান অর্জন করে। গত সাত আটের দশকে আর এক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। মধ্যবিত্তের ঔপনিবেশিক তাঁবেদারির বিরুদ্ধে উদ্যত সেই প্রতিক্রিয়া। তার একটি ফতোয়া ছিল, উনিশ শতকের অনেক মনীষীর শির না-নিলে বিপ্লবের কাজ ব্যাহত হবে। আক্রান্ত মনীষীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরও ছিলেন। মূর্তি ভেঙে একটা প্রতীকের নিষ্পত্তি কিছুদিন চলেছিল। তবে আমূল কোনো পরিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ডের জায়গায় প্রতীকের সান্ত্বনা আমাদের আধুনিক ইতিহাসে এতবার এতরূপে ফিরে এসেছে যে, ওই মূর্তিভাঙার উত্তেজনা খুব একটা বিস্ময়কর লাগে না।

অপরপক্ষে বিগ্রহের আসন নির্মাণে মিথের মতো ধ্যানধারণার সমাবেশ। অসামান্য সব গুণের মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। তার থেকে গড়ে ওঠে তেমন মূল্যায়ন যে, অতুলনীয় কর্ম ও কীর্তির মহিমায় বিদ্যাসাগর এক অলোকসামান্য প্রতিভা, সাধারণের গৌণতা আর মাঝারিপনার অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ। এমন স্বীকৃতিতে নিছক অত্যুক্তি নেই। মিথের কথায় মানা দরকার

যে বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট জীবন মহিমাতেই তো তেমন উত্তরণ সম্ভব। আবার যে জনসমষ্টির অঙ্গীকারে মিথের অবলম্বন, তার দিক থেকেও এরকম নির্মাণ অতিশয় সত্য। তাকে জড়িয়ে থাকে অনেক কল্পনা, অনেক অধরা উৎকর্ষের ভাবনা। কিন্তু কল্পনাই হক, অতিশয়োক্তির প্রেরণাই হক, জনসমাজের অন্তরে অন্তরে তাদের অনুরণন তো এক দুর্মর সত্য। তার সঙ্গে কখনোবা জড়িয়ে যায় বিদ্যাসাগর বন্দনার একরকম প্রবণতা। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে অনেক কর্তব্যের গাফিলতিকে তেমন বন্দনার আতিশয্যে আড়াল করবার অভিসন্ধি থাকে। অসামান্য এক প্রতিভা ও মহাপুরুষের কীর্তিতে সংশ্লিষ্ট অলৌকিকের (charisma) আবেদন এমন মায়াজালের উৎস। তার বাইরেই সম্ভব বিদ্যাসাগরের সম্যক পরিচয়। তবে মায়াজালের আচ্ছন্নতায় যে আকর্ষণ, তাও মিথ্যা নয়। তাই জীবনভর বহু প্রচেষ্টা, কীর্তি, ব্যর্থতা তথা সাধ ও সাধ্যের টানাপড়েন বাদ দিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তাভাবনায় যৌক্তিকতার বিশিষ্ট প্রবক্তা বিদ্যাসাগর। 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটি সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা, বেরিয়েছিল ১৮৫০এ 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায়। বাল্যবিবাহের দোষ বিচারে বিদ্যাসাগর ধর্ম, শাস্ত্র বা ঐশ্বরিক বিধানের পরোয়া করেননি। সার্থক বিবাহের জন্য প্রয়োজন স্ত্রীপুরুষের শরীরের উপযুক্ত বৃদ্ধি, তাদের মনের পরিণতি এবং পরিণত দেহমনে পরস্পরকে গ্রহণ। স্ত্রীপুরুষের শরীরমনের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ছিল বিদ্যাসাগরের আলোচনার আশ্রয়।

সংস্কৃত কলেজের সংস্কার পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর যে ইংরেজি জ্ঞান এবং যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন তা আমরা আগেই বলেছি। ব্যালান্‌টাইন প্রতিবেদনের সঙ্গে মতভেদে বিদ্যাসাগর লেখেন, 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। যদিও তা সম্ভব ধরে নেওয়া যায়, তবু আমার মনে হয়, প্রগতিশীল ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে সমাদরযোগ্য করা রীতিমতো কঠিন। তাঁদের কুসংস্কারগুলি বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল। সেগুলি নির্মূল করা সহজ ব্যাপার নয়। কোনো নতুন তত্ত্ব, এমন কি তাঁদের নিজেদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে তারই বর্ধিত রূপ যদি তাঁদের গোচরে আনা যায়, তাও তাঁরা গ্রাহ্য করবেন না। পুরনো কুসংস্কার তাঁরা অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরে থাকবেন। আরব-সেনাপতি অমরু আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে যখন খালিফ

ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন—আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালায় কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দেন, "গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরানের মত অনুযায়ী না হয় মতের বিরুদ্ধে লেখা। কোরানের মতের অনুরূপ যে-সব গ্রন্থ আছে কেবল একখানি কোরান রেখে সেগুলি স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে ফেলা যেতে পারে। আর কোরান-বিরোধী যেগুলি সেগুলি তো এমনিতেই অনিষ্টকর, সুতরাং ধ্বংস করতে বাধা নেই।" আমার বলতে সংকোচ হয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি এই আরব খালিফদের গোঁড়ামির চেয়ে কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত।' (বিনয় ঘোষ ১৯৭৩ : ১৭৯)

বিদ্যাসাগরের যৌক্তিকতার আর এক নিদর্শন তাঁর বাল্যপাঠ্য পুস্তকাবলী। বর্ণপরিচয়ের দুটি ভাগ, বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলীর মতো বইতে সদাচার, সত্যবাদিতা, গুরুজনদের সম্পর্কে বাধ্যতা, বা নগণ্য অবস্থা থেকে যত্নে শ্রমে সাফল্য অর্জন, এসব কোনো পরিস্থিতিতেই ঈশ্বরের পথনির্দেশ বা পারলৌকিক আস্থার কথা তোলেননি বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর যথেষ্ট মর্যাদা পাচ্ছেন না, এমন সমালোচনা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে অনেকেই করেন। কঠোর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করেছিলেন রেভাঃ জন মার্ডক। (স্বপন বসু ১৯৯৩: ১২৬-৩২) ভারতবর্ষে মার্ডকের কার্যকাল পঞ্চাশ বছর। দক্ষিণ ভারতে 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার বুক সোসাইটি', নিখিল ভারতীয় 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় কর্মী ছিলেন মার্ডক। তাঁর মনে বিদ্যাসাগরের রচিত পাঠ্য-পুস্তক 'সেকুলারিস্ট', ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ধর্মভাব সৃষ্টির সহায় নয়। মার্ডক-এর মতে, খ্রিশ্চান মিশনারি স্কুলে বিদ্যাসাগরের বই পড়ানো উচিত নয়।

বর্ণপরিচয় দুটি ভাগ নিয়ে তাঁর মন্তব্য—৬৭ পৃষ্ঠার কোথায়ও ঈশ্বরের সোজাসুজি বা পরোক্ষ উল্লেখ নেই, না আছে পরলোকের কথা। কোনো কোনো বাক্যে লর্ড স্টানলি কথিত 'শাশ্বত ন্যায়সূত্রের' স্বীকৃতি রয়েছে ; কিন্তু বালকদের কুকথা বা মিথ্যা বলার অপরাধ হলো, 'যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের সংশ্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংশ্রবে থাক, কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা কহিবে না, সকলেই তোমাকে ঘৃণা করিবে।' খ্রিশ্চান স্কুলের পক্ষে এমন নিরীশ্বর ভালমন্দের শিক্ষা মার্ডকের মনে হয় নিতান্ত অসমীচীন। তবে

নিছক বাংলা ভাষা শিক্ষণের উৎকর্ষে বিদ্যাসাগরের বই ব্যাপক স্বীকৃতি পায়। খ্রিশ্চান মিশনারী স্কুল সমূহেও বিদ্যাসাগরের বই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে বড় একটা সমস্যা হয়নি।

নৈতিকতা এবং শৃঙ্খলার ধারণায় অলৌকিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ বিদ্যাসাগরের চিন্তায় গুরুত্ব পায় না। ইহলোকের শিক্ষা এবং জীবনযাপনে অবশ্য বিদ্যাসাগর আজ্ঞানুবর্তিতাকে অপরিহার্য মনে করেন। সেখানে 'গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ-মা যখন যা বলেন, তাই করে।' আহারেবিহারে, লেখাপড়ায়, যাবতীয় নিত্যকর্মে গোপাল বাধ্যতার প্রতিমূর্তি। বিপরীতে অবাধ্যতার রূপ হলো রাখাল। কোনো বালকেরই তার মতো হওয়া উচিত নয়। সে লেখাপড়া শিখতে পারবে না। বাপ-মা তথা অভিভাবকের বশ্যতানিবন্ধন জীবনযাপন এবং লেখা-পড়ায় মনোযোগী হওয়াই আদর্শ বালকের কর্তব্য। বর্ণপরিচয়ের জগতে কোনো বালিকা নেই। আর আদর্শ বালকের আজ্ঞানুবর্তিতায় বিদ্যাসাগর সম্ভবত শিশু-শিক্ষার গণ্ডিতে শুরু করে বৃহত্তর জীবনেরও কোনো সংকেত দিচ্ছেন। (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ : ১১-১৩)

জনজীবন ও শৃঙ্খলার বিন্যাসে অনুগত প্রজা এবং প্রজাবৎসল রাজার সম্পর্ক ছিল বিদ্যাসাগরের অভিপ্রেত। ইংরেজ শাসন নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি প্রকাশ পায়নি। অর্থনীতির কঠিন সব সংকটে জড়িয়েছিল বিদ্যাসাগরের সামাজিক পটভূমি। সে সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া সরাসরি জানা যায় না। তবে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর এবং সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধানেও তাঁর সুদীর্ঘ প্রভাবের কথা সুবিদিত। দেশের সমাজ অর্থনীতি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে 'সোমপ্রকাশ'-এর ক্ষান্তি ছিল না। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে সম্পাদকীয় দায়িত্ব অর্পণে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হন। আবার বিদ্যাসাগরের মতো অর্থোপার্জনে কৃতকার্য বাঙালি ভদ্রলোক জমিদারিতে আকৃষ্ট না হওয়া সেদিনের এক বিরল দৃষ্টান্ত। বরং বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে একবার ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব দান করতে চাইলে বিদ্যাসাগর তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রধানত বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ নিবারণের উদ্যোগে নিবিষ্ট ছিল তাঁর সমাজ সংস্কারের কার্যক্রম। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতিতে, স্ত্রী শিক্ষার প্রাথমিক আয়োজনে এবং গরিব মধ্যবিত্তদের শিক্ষার সুযোগ বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কর্ম আর উদ্যম ছিল অপরিসীম। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও চর্চায় ইংরেজি পড়বার প্রয়োজনকে বিদ্যাসাগর গুরুত্ব দেন। আবার মার্জিত

সৌষ্ঠবমণ্ডিত বাংলা গদ্যের নির্মাণে সংস্কৃত এবং ইংরেজি উভয় ভাষার ব্যুৎপত্তিকে প্রয়োজন মনে করেন বিদ্যাসাগর।

এসব কাজে ইংরেজ রাজপুরুষদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। মার্শাল, মোয়েট, হ্যালিডে, বিডন প্রভৃতি অনেক সিভিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেই বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের কাজে কর্মেও তাঁরা সাহায্য করেন। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো রাজপুরুষের বিরুদ্ধতায় বিদ্যাসাগর বিপদে পড়েছেন। নৃপতির অনুগত পরামর্শদাতা বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যের কর্ণধার সেই নৃপতি। তেমন শাসনের স্বার্থে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে অসঙ্গতি ধরা পড়া অস্বাভাবিক নয়। অসঙ্গত মনে হলে রাজপুরুষদের অভিযোগ আপত্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগর আপোশ করেননি। ১৮৫৮-তে তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। তারপরে পুস্তক প্রকাশনা এবং সাফল্যে আর এক যৌক্তিকতার বার্তা আমরা শুনতে পারি।

রসময় দত্তের সঙ্গে মতভেদের দরুন বিদ্যাসাগর আগেও একবার চাকরি ছাড়েন। তখন থেকেই পুস্তক ব্যবসায়ের আরম্ভ। ১৮৫৮-তে সরকারি কার্যে ইস্তফা দেওয়ার পরে ওই ব্যবসায় হলো তাঁর জীবিকার প্রধান অবলম্বন। স্বাধীন ব্যবসার সঙ্গে যৌক্তিকতা আশ্রয়ী পাশ্চাত্য ব্যক্তিজীবনের যোগাযোগ ছিল এক বিশিষ্ট লক্ষণ। ব্যক্তি স্বাধীনতার সামাজিক বিন্যাসে তার ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। এমন জীবিকার অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের স্বকীয় বিচার ও দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আর ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু এক আগাপাস্তলা প্রতিযোগী ব্যক্তি। (স্বপন বসু ১৯৯৩ : ১৬৯-৮৮) সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি থেকে প্রকাশিত বইয়ের উৎকর্ষ এবং প্রচলিত পাঠক্রমে তার অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন বিদ্যাসাগর। সরকারের চাপ বা হুমকি কিছুতেই তিনি বইয়ের দাম কমাতে রাজি হননি। দাম না কমালে সরকার অন্য বই নির্বাচন করবেন এমন আশঙ্কা গর্ডন ইয়ং চিঠিতে দেখান। বিদ্যাসাগর কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তাঁর বক্তব্য যে প্রয়োজনে সস্তায় বিকল্প পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের অধিকার নিশ্চয় সরকারের আছে। কোনো বইয়ের ছাপার খরচ সরকার অগ্রিম দিলে বিদ্যাসাগর কিছুটা দাম কমাতে রাজি হন। এই উপায়ে কিছু নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক কয়েকবার ছাপা হয়। সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে বিদ্যাসাগর অগ্রিম প্রাপ্ত টাকা যথাসময়ে ফেরৎ দিতেন। স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য হওয়ার প্রস্তাব বিদ্যাসাগর প্রত্যাখ্যান করেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের দায়িত্বে ছিল ওই কমিটি। নিজে পাঠ্যপুস্তক

রচয়িতা এবং ব্যবসায়ী হয়ে বিদ্যাসাগর কমিটির সদস্য হওয়া অনুচিত মনে করেন। (Sen 1977 : 135-36)

পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের পক্ষে বিপক্ষে মন্তব্যের অভাব ছিল না। এমন কথাও উঠেছিল যে নিজের সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রকাশিত বইগুলিকে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলতে চাননা বিদ্যাসাগর। তখন সংস্কৃত প্রেসের একটি ভূগোল বই বাজারে চলছে। গুণাগুণ বিচারের জন্য কালিদাস মৈত্রের রচিত একটি ভূগোল বই সরকার থেকে বিদ্যাসাগরকে পাঠানো হয়। অনন্ত নাগের মাথায় পৃথিবী এবং কূর্ম পৃষ্ঠে অনন্তের অবস্থান, এসব মত বইটি খণ্ডন করে। বিদ্যাসাগর বইয়ের ভাষা নিয়ে আপত্তি করেন। তদুপরি বিদ্যাসাগর বইটি সম্পর্কে শাস্ত্রবিরোধিতার অভিযোগ করেন।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহপাঠী মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্যের দুটি বই 'আরবীয়োপাখ্যান' এবং 'অপূর্বোপাখ্যান' (চার্লস ল্যাম্বের 'টেলস ফ্রম শেকসপীয়র' অবম্বনে রচিত) বই দুটিকে বালকপাঠের অনুপযোগী মনে করেন বিদ্যাসাগর। কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'স্বভাবদর্পণ' বইটিরও একই হাল হয়। 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একটি চিঠিতে অভিযোগ ওঠে যে 'বিদ্যাসাগর চক্রান্ত করিয়া এরকম বিরোধিতা করিলেন।' 'আরবীয়োপাখ্যান' সাধারণের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের 'literary jealousy'-র কথা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপার্জনের নীতি ছিল বিশেষ জরুরি। সেখানে প্রতিযোগীদের বিষয়ে দয়া করুণাকে বিদ্যাসাগর প্রশ্রয় দেননি।

সমাজ সংস্কারের পক্ষে সমষ্টির সমর্থন পাওয়ার প্রয়োজনে বিদ্যাসাগরের যৌক্তিকতা কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হলো। শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পাঠক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত ছিল যে প্রাচীন ঋষিরা সর্বজ্ঞ নন এবং তাঁদের রচিত শাস্ত্রসমূহ অভ্রান্ত নয়। 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটির কথা আগেই বলেছি। সেখানে শাস্ত্রীয় বিধানের তীব্র সমালোচনা করেন বিদ্যাসাগর। ঘটনাচক্রে পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি শাস্ত্রীয় মীমাংসায় বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দিলেন। তখন আর শাস্ত্র পরিত্যজ্য নয়, তার সঠিক ব্যাখ্যা কী তাই নিয়ে তর্কাতর্কি। শাস্ত্রীয় অনুমোদন ব্যতীত হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন বা বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে জনসমর্থন পাওয়া সম্ভব মনে করেননি বিদ্যাসাগর। উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজের জগৎ ছিল তাঁর মূল বিবেচনার বিষয়। হিন্দু সমাজের

গড়ন এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধতায় উচ্চবর্ণের হিন্দুর ওপর বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় মীমাংসা বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলেনি। আর নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে বহুবিচিত্র কৌম রীতিনীতি আচারবিচারকে কোনো আমল দেয়নি ১৮৫৬-র বিধবাবিবাহ আইন। সেরকম কোনো তাগিদ বিদ্যাসাগরের চিন্তাতেও প্রত্যক্ষ নয়। পরবর্তী কালে এক আদালত থেকে অন্য আদালতে কোন জাতের হিন্দু, কী তাদের প্রচলিত প্রথানুগ নিয়মবিধি (customary law) তথা দেশাচার এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধবার সম্পত্তিতে অধিকার ও সতীত্ব ইত্যাদি প্রশ্নে আইন বিভ্রাটের ঘটনা কম নেই। (Lucy Carroll 1983 : 365-87)

শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি মনোযোগে আইনের প্রয়োজনও সক্রিয় ছিল। সেই ওয়ারেন হেস্টিংস, উইলিয়ম জোনস-জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আমল থেকেই তো হিন্দুর শাস্ত্রবচনের সঙ্গে ইংরেজ 'কমন ল'-র তালগোল পাকিয়ে তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক আইন ব্যবস্থা। মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শরিয়তি বিধানের সঙ্গে অনুরূপ মিশ্রণ ঘটেছে। হিন্দু বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে ইংরেজ সরকারের চাই শাস্ত্রীয় অনুমোদন বিষয়ে আশ্বাস ও অবহিতি। তখন বিদ্যাসাগরের কর্তব্য দাঁড়ায় সেই ব্যাখ্যার নির্মাণ, যা অভ্রান্ত শাস্ত্রবিচারে উত্তীর্ণ ব্যবস্থা এবং একই সঙ্গে তাঁর নিজের বিবেকে যুক্তি-গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত। পরস্পরবিরোধী দুই জ্ঞানতত্ত্ব এবং তাদের বিপ্রতীপ ভাবলোকের মন্থনে এরকম মীমাংসার দিশা খুঁজতে জীবনে মনে জ্বালাতনের শেষ নেই। ঔপনিবেশিক জগৎবেড়ে মননের এই জাতীয় সমস্যায় আমাদের চিন্তাভাবনা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তা আরব্ধ সমাজ সংস্কারের দায়ে জড়িয়ে গেল।

আরোহী যুক্তির নিয়মাবলী সম্বলিত জন স্টুয়ার্ট মিলের লজিক এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব অভিজ্ঞতার বোঝাপড়া ছিল বিদ্যাসাগরের পছন্দসই জ্ঞানরীতি। তাঁর শিক্ষা-সংস্কার, পাঠ্যপুস্তক রচনা, বোধোদয়ের বিজ্ঞান, বাংলা গদ্যের বিন্যাস প্রতি ক্ষেত্রেই তেমন উদ্যোগ প্রাধান্য পায়। আবার সংস্কৃত বিদ্যা, সনাতন দর্শন আর তর্করীতিতেও বিদ্যাসাগরের বিরাট ব্যুৎপত্তি। যার স্বীকৃতিতে তিনি বিদ্যাসাগর। 'জ্ঞানেই ক্ষমতা'-র মতো প্রেরণায় চিহ্নিত ছিল ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের ভাবলোক। বিদ্যাসাগর যুগপৎ তেমন ভাবনা এবং সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অধিকারী। শাস্ত্রবিচারের তর্কে বিতর্কে বিদ্যাসাগরের এই মিশ্রিত অধিকার এবং তার প্রয়োগ অনুপস্থিত নয়। বিদ্যাসাগরের সঞ্চয়ে এরকম বিপ্রতীপ জ্ঞানরীতির সংমিশ্রণ

অনেকের মূল্যায়নে উল্লিখিত হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ অনেক মনীষী নানাভাবে সেকথা বলতেন।

শাস্ত্রবিচারও যে কত বাহুল্য বর্জিত কাজের কথার মতো হতে পারে, বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা সাব্যস্ত করতে বিদ্যাসাগরের প্রথম বইটি তার বিশেষ নিদর্শন। সমকালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মন্তব্য করে, 'written in a clear business like argumentative style. It was graced by none of the ornaments of rhetoric, and owed its unprecedented circulation to the intense interest of the subject and the very becoming manner in which it was introduced,' (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ২৫৩) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কথায়, 'তাঁহার অভিলাষ ছিল যে তাঁহার যুক্তিবিন্যাসগুলি ইংরাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও ভাল লিখিতে পারে এরূপ লোক না পাওয়ায় নিরস্ত হইয়াছিলেন।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ৫৯)

জ্ঞানের বিভিন্ন গতিপ্রকৃতির আলোচনায় কৃষ্ণকমল বলেন, 'সকল দেশের শাস্ত্রেই প্রায় প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বিদ্যমান থাকে। কেবল Positive Science অর্থাৎ জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা আর উল্টাইবার জো নাই। পৃথিবী ঘুরিতেছে ; পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ বত্রিশ ফুট ; ২১২ ডিগ্রি উত্তাপে জল ফোটে ; এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে পাগলামি করা হয় মাত্র। নতুবা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না ; কলিতে ভিন্নজাতীয় বিবাহ হইতে পারে কি না ; ক্ষত্রিয় জাতি অদ্যাপি আছে, কি লোপ পাইয়াছে এ সকল বিষয় মতামত চিরকালই আছে ও থাকিবে।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ১২২)

বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ নিয়ে শাস্ত্রীয় তর্কাতর্কির অন্ত ছিল না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে কৃষ্ণকমলের কথা, 'তারানাথের যে প্রকার সর্ব-সংগ্রাহী শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহাতে কোনও একটি সিদ্ধান্তে স্থায়ী ভাবে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু অসাধ্য ছিল। তিনি প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। দুই প্রকারের যুক্তিই তাঁহার চক্ষুর উপরে সর্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ১২২) বহুবিবাহ প্রথার পক্ষে তাঁর সমর্থন ছিল না। তবে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় যুক্তিবিন্যাস তারানাথের বিচারসম্মত নয়। শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশ্নেই তিনি বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেন।

আত্মপক্ষ সমর্থনে তারানাথের শাস্ত্রচর্চায় ভ্রান্তি প্রমাণ করেই বিদ্যাসাগর থামেননি। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' প্রণীত নিবন্ধ দুটিতে ('অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল') বাচস্পতি মহাশয় সংস্কৃত জ্ঞানে বিচ্যুতির অভিযোগে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় আক্রান্ত হলেন। শাস্ত্রবিচারে ভ্রান্তি এবং সংস্কৃত বিদ্যার অভাব পরস্পর সংশ্লিষ্ট। তারানাথ বইটি সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। 'অতি অল্প হইল' থেকে একটি উদ্ধৃতিতে বিদ্যাসাগরীয় সমালোচনার মেজাজ বোঝা যায়,

"অত্যুচ্চৈঃ পতনায়"

এত কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর।
হতদর্প হইলে বাচস্পতি বাহাদুর ॥ ১ ॥
সকলের বড় আমি মম সম নাই।
কিসে এই দর্প কর ভেবে নাহি পাই ॥ ২ ॥
অতি দর্পে লঙ্কাপতি সবংশে নিপাত।
অতি দর্পে বাচস্পতি তব অধঃপাত ॥ ৩ ॥
দর্পে ফেটে পড় সবে কর তৃণজ্ঞান
অহঙ্কারী নাহি কেহ তোমার সমান ॥ ৪ ॥
তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বাচীন ॥ ৫ ॥

(গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ : ৪১৮)

অনেক সময়ে শাস্ত্রবিচারের সঙ্গে নিছক সাদামাঠা, আটপৌরে সব কাহিনীর বিবরণ জুড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর আপন সিদ্ধান্তে পৌঁছন। বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে আলোচনা এবং তার পরবর্তী তর্কাতর্কিতে এমন দৃষ্টান্ত বেশি আছে। অসম্ভব নয় যে, শাস্ত্রবিচারে নিবিষ্ট বিদ্যাসাগরই আবার আরোহী রীতিমাফিক দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার উল্লেখে সিদ্ধান্তের প্রামাণিকতা বাড়াতে চান। বিদ্যাসাগরের পরিহাস রসিকতায় সমৃদ্ধ থাকত তেমন সব তথ্য। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তারিফ করে বলেন, 'যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তার জন্য যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চস্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ১২৩) কৃষ্ণকমল আক্ষেপ করেন এ দেশে বিষয়ী লোকেরা সংস্কৃত প্রধান শাস্ত্র আলোচনাতে এরূপ রসিকতায় আমোদ পান

না, আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিদায় আদায় নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ব্যঙ্গ কৌতুক পরিহাসে পরিপূর্ণ বিদ্যাসাগরের এসব রচনায় বিশিষ্ট এক সৌকর্যের পরিচয় দ্রষ্টব্য। নানারকম লোকের আপন আপন কথাবার্তা ও সংলাপ মিলে তৈরি হয় এর অধিকাংশ কাহিনী। ব্যক্তি বিশেষের বাচন এবং তার গতিবিধি বিবরণের অঙ্গীভূত করেন বিদ্যাসাগর। এমন অনেক স্বরের সমাহারে গদ্যরীতিতেই সংবেদ্য হয়ে যায় বহুস্বরের ব্যঞ্জনা এবং তার বাস্তবতা। (প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য 1998 : 149-154)

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বচনে আশ্রয় নিয়েছিল সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা। অপরদিকে তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকে নিরীশ্বর নৈতিকতার কথা আগে উল্লেখ করেছি। সংস্কৃত কলেজ সংস্কারের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর ছিলেন যৌক্তিকতার বিশিষ্ট প্রবক্তা। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-র কথক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগরের পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। হিন্দু দর্শন বিষয়ে মহেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'আমার তো বোধ হয় ওরা যা বুঝতে গেছে বুঝাতে পারে নাই!' (শ্রীম ১৯৮৩ ব. : ১৫৮)

হিন্দুদের প্রথামতো বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম বিদ্যাসাগরের স্বীকৃতি পায়। পিতামহী, মাতা-পিতার পারলৌকিক কাজের আচার অনুষ্ঠান পালনে তাঁর কোনো ত্রুটি ছিল না। গলায় উপবীত ধারণ করতেন বিদ্যাসাগর এবং নিজের বাংলা চিঠিতে সর্বদা 'শ্রীশ্রীহরিশরণম্' লিখে শুরু করতেন। হিন্দু দর্শনে অনাস্থা প্রকাশ করলেও, অন্তত প্রধান প্রধান কিছু ধর্মীয় আচার-বিচার বিদ্যাসাগরের গ্রাহ্য ছিল।

তাঁর সমকালীন ব্রাহ্মধর্ম বা ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন থেকে তিনি ঠিক বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তবে ধর্মীয় বা বিধর্মীয় প্রবণতা, ঈশ্বর বা ব্রহ্মস্বরূপের আলোচনা বিদ্যাসাগরকে আকর্ষণ করেনি। মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐহিক মঙ্গলের ব্রতকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। একটি বিশিষ্ট গবেষণায় (Brian A Hatcher 1996 : 230-40) তরুণ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিবৃত হয়েছে। সভ্যদিগের বক্তৃতা সংকলনে 'ঈ' স্বাক্ষরিত দুটি নিবন্ধ যে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা তার প্রমাণ স্বরূপ ব্রায়ান হ্যাচার অনেক যুক্তি দিয়েছেন। নিঃস্বার্থ সংযমী জীবনের আহ্বান নিবন্ধগুলির বিষয়বস্তু। যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৬৫ শক, ১ ফাল্গুণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঈ' স্বাক্ষরযুক্ত বক্তৃতা শেষ হচ্ছে 'অতএব হে সভ্য মহোদয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কাম ক্রোধাদিকে আপনার অধীনে রাখিয়া বিচার দ্বারা যথা উপযুক্ত মত নিয়োগ করিয়া

সংসার নির্ব্বাহ করিতে যত্নশীল হউন যাহার দ্বারা সকল প্রকার দুর্গতি হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা।' ব্রায়ান হ্যাচার-এর প্রমাণ ঠিক না বেঠিক সে প্রশ্নের উত্তরে অনিশ্চয় থাকলেও বলা যায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা ন্যায়পরায়ণ মানুষ এবং সমাজহিতের আদর্শে নিবিষ্ট ছিল। ঈশ্বর চিন্তা বা তাঁর স্বরূপ নির্ণয়ে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কোনো আগ্রহের কথা আমাদের জানা নেই।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে রামকৃষ্ণর আগমন এবং তাঁদের আলাপ পরিচয়ের বিবরণ নিশ্চয় গভীর তথ্যমূল্যে সমৃদ্ধ। পারস্পরিক সৌজন্যে পরিপূর্ণ সে আলাপ। বিদ্যাসাগর মূলত শ্রোতা, দর্শক, আর অবশ্যই অতিথিকে সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে তৎপর। বিশ্বাসঅবিশ্বাস, মতৈক্যের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর প্রধানত নীরব। সাম্য অসাম্যের প্রশ্নে আবার একটি সংলাপের ব্যঞ্জনা অপরিসীম, কিন্তু নিষ্পত্তি সুদূরপরাহত। (শ্রীম ১৯৮৩ : ১৫৯) রামকৃষ্ণ বলছেন,

> দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিষ—চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড়, ছোট, ভাল মন্দ, কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।
>
> বিদ্যাসাগর—তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ! তা না হ'লে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি সিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার দয়া তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ কথা মানো কি না? (বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন)।

দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার আমন্ত্রণে বিদ্যাসাগর রাজি হয়েছিলেন। যাওয়া হয়নি। তার প্রতিক্রিয়ায় রামকৃষ্ণের একটি উক্তিতে—'বিদ্যাসাগর মিথ্যা বলে কেন?'—আমরা ক্ষোভের পরিচয় পাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'তাঁকে তো জানবার যো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয় পৃথিবী স্বর্গ হ'য়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়। (শ্রীম ১৯৮৩ : ১৫৮)

নাস্তিকতা নিয়ে বিচারবিবেচনায় জটিলতার শেষ নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের মন্তব্য বিদ্যাসাগর যে রকমের নাস্তিক তাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী। (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ২৯৩) আবার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন, 'কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক he can write and he can fight, and he can slight all things divine.' (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ১৩২) এহেন কৃষ্ণকমলের কথায়,

> উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন আরব্ধ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল, যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাঙ্গলাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই; ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason-এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব বন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্ম্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ১৩১-৩২)

আবার,

> চিঠির উপর শ্রীহরি লেখা থাকিলে লোক নাস্তিক হয় কিনা ইহার উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; তবে আমি শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, কোনও কোনও সময়ে বিদ্যাসাগর এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন,—'ঈশ্বর যদি থাকেন ত তিনি ত আর কামড়াবেন না।' এ কথা আস্তিক বা নাস্তিকের মুখে শোভা পায় তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন। (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ৩০৪)

প্রতিকূল সমাজে সংসারে

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র আট বছর। বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। এদেশে ইংরেজের প্রথম রাজধানী কলকাতা। কলকাতার দিকে হাঁটাপথে রাস্তার 'মাইলস্টোন' দেখতে দেখতে 'ইঙ্গরেজীর অঙ্ক' চিনে ফেলার আশ্চর্য কাহিনী আমরা আগেই শুনেছি। সূচনার সেই অপূর্ব উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন পরিণত বিদ্যাসাগরের কাজে সামাজিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান

বিজ্ঞানের পরিগ্রহণ অপরিহার্য মনে হয়। শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ব্যাপারে যুক্তিগ্রাহ্য নৈতিকতা এবং আলোকপ্রাপ্ত সমাজবিবেকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন বিদ্যাসাগর। শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক হিতসাধনের উদ্দেশ্যে অনিবার ছিল তাঁর আজীবন সংকল্প এবং কর্মময়তা।

বিদ্যাসাগরের একাধিক জীবনী এবং নানাজনের স্মৃতিকথা আর টুকরো টুকরো সব গল্পকাহিনী থেকে তাঁর অজস্র বৈচিত্র্যের কথা আমরা জানতে পারি। তেমন প্রচুর দৃষ্টান্ত এই আলোচনার আগাগোড়া ছড়িয়ে আছে। কথা ও কাহিনীর যেন শেষ নেই। যেমন বিদ্যানুরাগের একটি দৃষ্টান্ত। অকুণ্ঠ অর্থব্যয় ও সযত্ন প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে গড়ে ওঠে অমূল্য গ্রন্থসঞ্চয়। সমাজে সংসারে অনবরত কঠিন সব কর্তব্যের বোঝা বইতে বইতে এসব অনেক বই পড়ে উঠবার সময় পাননি বিদ্যাসাগর। তার দুঃখে একদিন কেঁদে বলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনো করি, কিন্তু কৈ তা হলো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।' (শ্রীম ১৯৮৩ : ১৫৭) কী ধরনের চিঠিপত্র বিদ্যাসাগর দিনের পর দিন পেতেন সেসব নমুনা থেকে প্রতীয়মান তাঁর পরহিত-ব্রতের সংকল্প ও বিস্তার,

> কোন বিধবা হয়ত লিখিয়াছে—আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হ'বে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরীব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছেন না—আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হ'বে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত, কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন অমুখ তারিখ সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন। (শ্রীম ১৯৮৩ : ১৫৭)

আবার সর্বজীবের প্রতি দয়ার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর এক বিরল ব্যক্তিত্ব। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখে তিনি দীর্ঘদিন দুধ খাওয়া বন্ধ করেন। গাড়িতে চড়ায় আপত্তি ছিল কারণ ঘোড়া নিজের কষ্ট বলতে পারে না।

রোগক্লিষ্ট অসহায় লোককে রাস্তা থেকে বাড়িতে এনে সেবা শুশ্রূষা করতে উদ্যোগী হতেন বিদ্যাসাগর। মাতাপিতার প্রতি অপরিমেয় ভক্তির অনেক কাহিনী তার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যাসাগর নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি বাৎসল্য ও সযত্ন সহায়তায় ত্রুটি করেননি।

এসব প্রতিটি কাহিনীর সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের প্রশ্ন অবান্তর। এমন মানুষের জীবনে জড়িত সব গল্পকথায় একটা সত্যের দিক আছে। প্রকৃত ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাই হক, বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট প্রতিভা ও মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করে লোকমুখে, জনমানসে নানা কাহিনী উপ্‌ছে পড়ে। তেমন কথা ও উপকথায় মিলিত বিদ্যাসাগরের জীবন ও মিথের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক।

জটিল ইতিহাসের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জড়ানো সব অনুষঙ্গে বিস্তৃত বিদ্যাসাগরের জীবন। উনিশ শতকে রাজনারায়ণ বসু সে কাল আর এ কালের মধ্যে যেসব পরিবর্তনের বিচার করেছিলেন তার গ্রহণবর্জনে অন্য অনেকের মতো বিদ্যাসাগরও ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট। কালান্তরের গতিপ্রকৃতিকে একরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন রাজনারায়ণ। বিদ্যাসাগরের জীবন-জিজ্ঞাসায় তার কোনো হুবহু পুনরাবৃত্তি নেই। তবে ইংরেজ শাসিত উপনিবেশে ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের সেই সমস্যা বিদ্যাসাগরকেও কম চিন্তায় ফেলেনি—‘বাহিরে শেক্‌সপীয়র, মিল্‌টন ও ডিফরেন্‌শিয়ল কেলকুলসের চাক্‌চিক্য, ভিতরে সব ভুওয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের উপর নির্ভর, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না।’ (রাজনারায়ণ বসু ১৩৫৮ ব. : ৬৬-৬৭)

১৮৩৩এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন চার্টারে দেশীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাম্রাজ্যের সহযোগিতায় এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতের আভাস ছিল। তার পরের বছরগুলিতে বেন্টিঙ্ক মেকলের শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হলো। ঈশ্বরচন্দ্র তখন সংস্কৃত কলেজের কিশোর ছাত্র। আর আট বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় আসেন ঈশ্বরচন্দ্র। পরের বছর সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণীত হয়। মেকলের নীতিতে মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে ইংরেজি জ্ঞানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সেই সূত্রে গড়ে ওঠে আমলা, উকিল, মোক্তার, মাস্টার, কেরানি ইত্যাদি বহুতর বৃত্তির অবলম্বন। ছোটবড় মিলিয়ে ভূমিস্বত্বের অধিকারও অনেক ক্ষেত্রে এমন বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তেমন নানাধরনের মিশ্রণে সংশ্লিষ্ট মধ্যবিত্তের নানা স্তর। স্তরে স্তরে আসা যাওয়ার এক বিশেষ দৃষ্টান্ত দরিদ্র ঈশ্বরচন্দ্র থেকে গৌরবান্বিত বিদ্যাসাগরে উত্তরণ।

ইংরেজ শাসকদের ঘোষণা ছিল এদেশের উন্নতি (improvement) তাঁদের আরব্ধ কর্তব্য। নিজের উন্নতির জন্য অনেক বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করেন ঈশ্বরচন্দ্র। তা ছিল কলকাতায় আগন্তুক এক দরিদ্র নগণ্য বালকের বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠার কঠিন পথ। তারপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরির অভিজ্ঞতায় বিদ্যাসাগর বিদেশী রাজকর্মচারীদের কাছে সৌজন্য ও স্বীকৃতি অর্জন করেন। সব মিলিয়ে তাঁর এই সহযোগিতা বিদেশী নৃপতির উন্নতি কর্মেই নিবিষ্ট ছিল। সংস্কৃত কলেজের আধুনিকীকরণ, শিক্ষার প্রসার, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, পাঠ্যপুস্তকে ভাষা এবং নীতিশিক্ষার যুগপৎ সংস্থাপন, রচনা ও প্রকাশনে বাংলা গদ্যের যুগান্তর ইত্যাদি বহু কীর্তিতে পরিপূর্ণ বিদ্যাসাগরের উন্নতিময় কর্মক্ষেত্র। দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক, তবে বিদেশী রাজশক্তির অন্তরায় নয়।

ইংরেজ শাসনের নির্বন্ধে প্রজা তোষণের কৌশলমতো improvement তথা উন্নতির কথা আসে। এনলাইটেনমেণ্ট তথা আলোকপ্রাপ্তির যে আবেদনে ওই উন্নতির সারমর্ম তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় বিদেশী প্রভুত্বের কঠোর সত্য। তাই উন্নতির বোঝাপড়ায় সতত আয়রনির ব্যঞ্জনা অনিবার্য। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার নিরন্তর শোষণ পীড়নে পর্যুদস্ত দেশকালের অজস্র খণ্ডবিখণ্ড পরিসর। সেখানে উন্নতির স্বরূপ তো নিতান্তই বেহাল, ভাঙাচোরা এক ব্যাপার! উনিশ শতকের অন্তিম অবস্থায় স্পষ্ট যে বাংলার কৃষিতে উৎপাদনের বিকাশ অতি মন্থর, সস্তায় বিলেতি আমদানির ধাক্কায় দেশজ শিল্পের সর্বনাশ হয়েছে, আর আলোকপ্রাপ্তির প্রভাবে মধ্যবিত্তের সাধ যত বেড়েছে সে তুলনায় সাফল্যের সুযোগ অতি সংকীর্ণ।

বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা তথা আলোকপ্রাপ্তি নিরন্তর পরিবেশের এই জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রবর্তিত সংস্কার অনেকটা কাজ দিয়েছিল। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষাকে অপরিহার্য মনে করতেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে ইংরেজির অন্তর্ভুক্তিতে বিদ্যাসাগর বিশেষ উদ্যোগী হন। তাঁর বিবেচনায় আধুনিক বাংলা গদ্যের নির্মাণে সংস্কৃত ও ইংরেজিতে যুগপৎ ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। দেশীয় প্রচেষ্টায় মেট্রোপলিটান কলেজের সাফল্য বিদ্যাসাগরের কীর্তির মধ্যে অগ্রগণ্য।

এ যেন ইংরেছি শিক্ষায় ইংরেজদের সমকক্ষ বাঙালি পরিচালন দক্ষতার নিদর্শন! তবে কিছু দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে ইংরেজি শিক্ষার ফলাফল বিচারে বিদ্যাসাগরের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ধরন কীরকম ছিল।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানি যে কালিদাসের তুলনায়

শেক্‌সপীয়রের উৎকর্ষব্যঞ্জক হেমচন্দ্রের সেই কাব্যোক্তিতে—'ভারতের কালিদাস জগতের তুমি'—বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হন। অভিযোগ যে হেমচন্দ্র তো সংস্কৃত জানেন না। কৃষ্ণকমলের কথায় '…হেমবাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরেজি সর্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই উহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কথাটা বিদ্যাসাগরের মনে লাগিল। আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—"বটেই ত, খেতে, বস্‌তে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।" (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ২৯) সনাতন সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অগাধ অধিকার বিদ্যাসাগরের ছিল। কিন্তু ইংরেজি বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। আবার বিধবাবিবাহ বিরোধী জনৈক ইংরেজি শিক্ষিত তার্কিকের কথাবার্তায় তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না ; অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব. : ১২৭)

পাশ্চাত্য দর্শনে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের বিষয়কে বিদ্যাসাগর বিশেষ গুরুত্ব দেন। আত্মসংযম, শৃঙ্খলা এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার অনুশীলনে নিবিষ্ট চরিত্র গঠনের হিতোপদেশে পরিপূর্ণ তাঁর রচিত সব পাঠ্যপুস্তক। আর দুঃস্থ, অসহায় অবস্থা থেকে স্বকীয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ে গড়ে ওঠা কৃতী পুরুষদের দৃষ্টান্তে ভরে আছে 'চরিতাবলী'র মতো বই। ইংরেজি জ্ঞানের প্রয়োজন এবং ইংরেজ চরিত্রের গুণের দিককে স্বাগত জানালেও, সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের জন্য বিদ্যাসাগর কখনও নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেননি। বেশভূষায়, আচারে ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং তার উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগরের অবদান বিরাট। ইওরোপীয়দের অনুকরণ নয়, নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য মহাজনদের তুলনীয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় তেমন বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য বোঝা সম্ভব,

> বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই ; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি ; নিজত্ব কাহাকে বলে, জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ

অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নাম নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎব্যক্তিরা এই নিজত্ব প্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক, অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৭ ব. : ৪৮০)

বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের এমন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বারবার চোখে পড়ে। ঔপনিবেশিক সমাজ অর্থনীতিতে অবরুদ্ধ জনসমাজে যথেষ্ট সমর্থন, সহযোগিতা কখনও পাননি বিদ্যাসাগর। বিধবাবিবাহের প্রবর্তনকে তিনি নিজের মহত্তম কাজ মনে করতেন। তার অনুকূলে একটি আইন প্রণীত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের অন্য প্রস্তাব বহুবিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে কোনো আইন বিধিবদ্ধ করেননি ইংরেজ সরকার। হিন্দু সমাজের গড়ন এবং দেশাচারের বিরুদ্ধতায় বিধবাবিবাহও বিশেষ প্রচলিত হয়নি। সমাজের নানাবিধ প্রতিকূলতায় বিদ্যাসাগর খুবই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন। তাই বলেছিলেন দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ জানলে তিনি বিধবাবিবাহ দিতে উদ্যোগী হতেন না।

বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ পরোপকারের সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে লোকের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচরণের শেষ ছিল না। বহু লোকের আচরণে তাঁর ধারণা হয় যে উপকৃত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই কৃতঘ্ন হয়। কেউ তাঁর নিন্দা করেছে শুনলেই বলতেন 'রও, ভেবে দেখি, সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করবে কেন? আমি ত কখনও তাহার উপকার করি নাই।' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯৪ ব. : ৪৪৬)

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অর্থ সাহায্যের জন্য বিদ্যাসাগর প্রচুর ঋণ করেন। সেই ঋণ শোধ করতে নিজের পুস্তক প্রকাশনার প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃত প্রেস'-এর দুই-তৃতীয়াংশ বেচে দেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও একান্ত সুহৃদ ও বিরল প্রতিভা মধুসূদনকে তাঁর আত্মঘাতী অমিতাচারে নিবৃত্ত করতে পারেননি বিদ্যাসাগর। মাইকেলের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে তাঁর সমাধি নির্মাণের জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চাইলে তিনি বলেন, 'প্রাণপণ চেষ্টা করে যাঁর জান রাখতে পারিনি তাঁর হাড় রাখবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।' (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৩৮৭)

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের বড় একটা ঝোঁক ছিল না। তাঁর আরব্ধ সমাজ সংস্কার বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে অবশ্য বিদ্যাসাগর ধর্মীয় বিধি পালনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সম্ভবত হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্র-

সম্মত ব্যবস্থা তা প্রমাণের আগ্রহ প্রাধান্য পেয়েছিল। একেই রাজনারায়ণ বসু স্বদেশীয় ভাবের পত্তনভূমিতে সমাজ সংস্কারের প্রবৃত্তি বলেছিলেন। আবার পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম পালনে বিশ্বাসী। বিস্তৃত আয়োজনে করেছিলেন নিজের মা-বাবার শ্রাদ্ধ। পিতামহীর শ্রাদ্ধে প্রচুর খরচ করেন বিদ্যাসাগর। পিতা ঠাকুরদাসের আশঙ্কা ছিল তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। কারণ বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা। তবে বিধবাবিবাহের বিরোধীপক্ষ সফল হয়নি। নানাপ্রকার কল্যাণ কার্যে বিদ্যাসাগর অনেকের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন ও বিদায়ের উপলক্ষে বিরাট সমারোহ হয়। (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৯৯২ : ১০৫) ১৮৬৪-তে নিমতলা শ্মশানঘাট তুলে দিয়ে শহরের বাইরে ইঞ্জিন দিয়ে শবদাহের প্রস্তাব এসেছিল। এর বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের প্রবল আপত্তিতে সহযোগী হন বিদ্যাসাগর। প্রস্তাবটি নাকচ করতে বিদ্যাসাগর বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন। (Subal Chandra Mitra 1975 : 493-95)

অসামান্য মর্যাদাসম্পন্ন দয়ালু মহিলা ছিলেন বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী। একবার বীরসিংহের বসতবাড়ি আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তিনি কলকাতা যেতে চাননি। গরিব এবং নিঃস্ব প্রতিবেশী শিশুদের খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি না থাকলে হবে না এই ছিল যুক্তি। দান-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে জাতিভেদের কোনো বিচার ভগবতী দেবীর ছিল না। আর একবার তিনি বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজো বন্ধ রাখলেন। পূজোর বাবদ টাকা গরিব ও দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য ব্যয়ে ভগবতী দেবী রাজি হন। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৫৯২) যুক্তিনিষ্ঠা এবং মানবিকতায় নিবিষ্ট পুত্র বিদ্যাসাগরের লালন ও প্রেরণায় ভগবতী দেবীর অবদান ছিল অমূল্য। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি নিয়ে দৃষ্টান্তের শেষ নেই।

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস হত দরিদ্র অবস্থা থেকে কঠিন জীবন সংগ্রামে কখনও সৎ কর্মময়তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। দুঃখকষ্ট সম্পর্কে তাঁর নির্বিকার সহ্যশক্তির অন্ত ছিল না। এমন পিতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং তাঁর সতত সেবা-যত্নে বিদ্যাসাগর এক আবেগপূর্ণ মানবিক আশ্রয় লাভ করেন। কাশীর পাণ্ডাদের বিদ্যাসাগর একবার বলেছিলেন যে মন্দিরে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন তাঁর কাছে অনাবশ্যক। নিজের পিতা-মাতার সান্নিধ্যেই তিনি সর্বদা বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার আশীর্বাদধন্য। (Sen 1977 : 158)

বিদ্যাসাগরের সাংসারিক জীবনে অশান্তি দেখা দেয়। একটি দুঃস্বপ্নে ঠাকুরদাস

দেখলেন যে তাঁদের বসতবাটি শ্মশানে পরিণত আর বিদ্যাসাগরের জীবনে নানা বিপর্যয়ের পরম্পরা আসন্ন। এর প্রতিক্রিয়ায় ঠাকুরদাস কাশীবাসী হওয়া মনস্থ করেন। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও ঠাকুরদাস নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি। বাকি জীবন তিনি কাশীবাসী হন। বিদ্যাসাগরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ঠাকুরদাসের কাশীবাসের পক্ষে মত দেন। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৩৮৮-৮৯) ঠাকুরদাস চলে যাওয়ার দু-বছরের মধ্যে বীরসিংহের বাড়িতে একান্নবর্তী ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর পরিবর্তন করেন। তিন ভাইয়ের সপরিবারে বসবাসের ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো, আহারের ব্যবস্থাও তাই। মায়ের সব দায়িত্ব বিদ্যাসাগর নিজে নেন। পুত্র নারায়ণেরও আলাদা ব্যবস্থা করে দেন বিদ্যাসাগর। পরিবারে সকলে সুখে শান্তিতে থাকবেন তাই ছিল বিদ্যাসাগরের প্রত্যাশা। (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৯৯২ : ১৩৬)

নতুন ব্যবস্থার কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় সহোদর দীনবন্ধু সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরির অর্ধেক অংশ দাবি করলেন। প্রতিষ্ঠানের পুরাতন ও একান্ত বিশ্বস্ত কর্মী ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে তা দান করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিচারক দ্বারিকানাথ মিত্র এবং ব্যারিস্টার দুর্গামোহন দাশকে এ ব্যাপারে সালিশী করবার দায়িত্ব দিলে দীনবন্ধু দাবি প্রত্যাহার করেন। নিজের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দীনবন্ধুর ছিল না। সব ভাইকেই বিদ্যাসাগর নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। এই ঘটনার পর দীনবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করে বিদ্যাসাগরের মনে আঘাত দেন। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ১৯৪-৯৫)

সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি নিয়ে বিবাদের বছর খানেক পরে বীরসিংহে একটি বিধবাবিবাহের উল্টোপাল্টা ঘটনায় বিদ্যাসাগর চিরতরে নিজের গ্রাম পরিত্যাগ করলেন। উল্টোপাল্টা বলছি কারণ বিদ্যাসাগরের নিষেধ সত্ত্বেও একটি বিধবাবিবাহ হওয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর এই উষ্মা। অথচ বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে জীবনের পরম কর্তব্য মনে করতেন বিদ্যাসাগর। ক্ষীরপাই নিবাসী জমিদার স্থানীয় সম্ভ্রান্ত হালদারবাবুদের ভিক্ষাপুত্র এই বিয়ের পাত্র মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। পাত্রী কাশীগঞ্জের মনোমোহিনী দেবীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে বীরসিংহে আনা হয়। বিয়ে দেওয়ার জন্যই সেবার বিদ্যাসাগরের বীরসিংহে আগমন। হালদারবাবুদের বিশেষ অনুরোধে বিদ্যাসাগর কথা দেন ওই বিয়ে হবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভ্রাতৃবর্গ এবং কয়েকজন প্রতিবেশীর উদ্যোগে তাঁর অজান্তে বিয়ে হয়ে যায়। তারপর

বিবাহের পরদিন সকালে বিদ্যাসাগর ঈশানচন্দ্রকে বললেন—ঈশান, তুমি কেন বিবাহ দেওয়ালে, এতে আমার বড়ো অপমান হয়েছে।

ঈশান বলল—কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরশু আপনাকে জিজ্ঞেস করি 'এই বিধবাবিবাহ ন্যায্য কি না?' আপনি উত্তর দিয়েছেন, 'এ শাস্ত্র-সম্মত ও ন্যায্য বলে আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদারবাবুদের মনে দুঃখ হবে।' লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়া আপনার মতো মানুষের পক্ষে দোষের কথা।

বিদ্যাসাগর রাগ করে বললেন—তুই কি এখনো সেইরূপ দুর্মুখ আছিস এবং এইরূপই কি চিরকাল থাকবি? আরো দু-চার কথার পর বিদ্যাসাগর বললেন—আমি আর দেশে আসব না। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৩৯৬)

বিধবাবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনে এমন ঘটনা ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাস! কলকাতায় ফিরে পিতামাতা, স্ত্রীকে চিঠি লেখেন—সংসারের ব্যাপারে তিনি আর জড়িত থাকতে চান না। তবে এঁদের আর্থিক প্রয়োজনে যথাযথ দায়িত্ব পালনে বিদ্যাসাগর তৎপর হবেন। বাবাকে লিখলেন, 'সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।' (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৪০০)

বীরসিংহ ছেড়ে আসার পরে এই চিঠি। এর বছর পাঁচেক আগে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' রচনাতেই বিদ্যাসাগর লেখেন, 'কিছুদিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে।…ইদানীং একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম।' (গোপাল হালদার ১৯৭২ গ. : ৪৩১)

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর তিন বছর বয়সে আকস্মিক মৃত্যু হয়। প্রভাবতী ছিল বিদ্যাসাগরের একান্ত স্নেহের পাত্রী। প্রভাবতীর স্মৃতি জিইয়ে রাখার জন্য এই প্রবন্ধের রচনা। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে তা প্রকাশিত হয়নি। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম এই লেখা প্রকাশ করেন।

একমাত্র পুত্র নারায়ণের আচরণেও বিদ্যাসাগর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। ১৮৭৫-এ কৃত তাঁর উইলে নির্দেশ ছিল যে 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর

কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংশ্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। সেই হেতুবশতঃ বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।' (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ গ. : ৫৪৩-৪৪) বিদ্যাসাগর-পত্নী দিনময়ী পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হননি। অবশ্য দিনময়ীর মৃত্যুশয্যায় তাঁর ব্যাকুল অনুরোধে বিদ্যাসাগর নারায়ণকে ক্ষমার কথা কিছুটা মেনে নেন।

লোকহিতের পরিসর

সমাজে সংসারে বিরূপ সব অভিজ্ঞতায় বিদ্যাসাগরের জীবন নিদারুণ বিষাদ ও নিঃসঙ্গতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। যৌক্তিকতার প্রয়োগ এবং সমাজ কল্যাণের ব্রত ছিল তাঁর একান্ত অভীষ্ট। সে ব্রতযাত্রায় অনবরত বাধাবিঘ্নের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতায় বিদ্যাসাগরের মনে হয় যে অর্থলোভে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অসাধ্য কোনো দুষ্কর্ম নেই। অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যেও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার অভাব ছিল না। ইংরেজ নৃপতির প্রতি আস্থায় তাঁর কর্মজীবন শুরু। ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যায় ও অত্যাচার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কোনো প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া জানা নেই। স্বদেশবাসীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সামর্থ্যেও তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে নিজের বহু উদ্যোগে তিনি জনসাধারণের যথেষ্ট সহযোগিতা পাননি। তার থেকেই হয়তো দলগত প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরের খুব ভরসা ছিল না। জীবনের শেষ দু-এক দশকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন এবং তারপরে জাতীয় কংগ্রেসের সূচনায় বিদ্যাসাগরকে ঠিক উৎসাহী মনে হয় না। উল্লেখযোগ্য যে ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগর বেঙ্গল অ্যাসোশিয়েসন নামে একটি সংগঠন তৈরিতে প্রয়াসী হন। উপযুক্ত জনসমর্থনের অভাবে তা তখন করা যায়নি। (Sen 1977 : 132) অবশ্য সাধারণের বিপদকালে বিপুল উদ্যমে বিদ্যাসাগর সেবা কর্মে লিপ্ত তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৮৬৬-৬৭ সালে ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময় বিদ্যাসাগর বীরসিংহে অন্নসত্র স্থাপন করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় সরকারি সাহায্যে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানেও অন্নসত্র খোলা হয়েছিল। আর একবার ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বর্ধমানবাসীদের রক্ষাকল্পে বিদ্যাসাগরের সর্বাত্মক প্রয়াস

উল্লেখযোগ্য। তাঁর বাড়ির নিকটস্থ মুসলমান-পল্লী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। রোগীর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর নিজের বাড়িতেই ডিসপেন্সারি স্থাপন করেন।

কিশোরপাঠ্য আখ্যানমঞ্জরীর প্রথম খণ্ডে এক কাহিনীতে বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দেন 'সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।' (গোপাল হালদার ১৯৭২ ক : ৩২৪) বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে আবার একটি কাহিনীতে 'অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতিশিক্ষা' লাভের কথা আছে। (গোপাল হালদার ১৯৭২ ক. : ৩৯০) ভাবা যায় আত্মম্ভরিতা, চাতুরী ও শঠতাবর্জিত 'অসভ্য' জাতিদের সরল জীবন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট অনুভব ছিল। বিষাদগ্রস্ত নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগরের কথা বলেছি। মনের এই অবস্থায় সাঁওতালদের অকপট সারল্য তাঁকে আকর্ষণ করে। কর্মাটাড়ে একটি গৃহের ব্যবস্থা করে তিনি অনেক সময়ে কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন সাঁওতাল প্রতিবেশে দিন যাপন করতেন। সেখানে সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাদের সুবিধা মতো লেনদেন এবং রোগীদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কথায়, '...কর্মটাড়ে বাস করিয়া তিনি সাঁওতাল জাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন। একটা গল্প তাঁহার মুখে শুনা যাইত। একবার একজন চতুর বাঙালি সাঁওতাল পরগণায় কিছু জমি খরিদ করিয়া কাছাকাছি পাঁচজনের জমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সীমাসহরদ্দ লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাঙালিটি অনেক প্রলোভন দেখাইয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড় করাইল; তাহাকে শিখাইয়া রাখিল যে, সে বলিবে অমুক শিমুল গাছ হইতে সীমানার আরম্ভ। সাঁওতাল রাজী হইল। মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল—অমুক শিমুল গাছটা বটে, পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; আপনা হইতে বলিয়া উঠিল, কিন্তু ঐ গাছটি বটে, বলিয়া আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গল্পটি করিতেন আর হাসিতেন; বলিতেন "দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাদাসিধে আছে, সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না।"' (বিপিন-বিহারী গুপ্ত, ১৩৭৩ ব. : ১২৭-২৮)

বীরসিংহের শৈশব, কলকাতার গৌরবধন্য ছাত্রজীবন, নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে সমাজে অগ্রগণ্য মানুষের প্রতিষ্ঠা অর্জন, নিরলস বহুমুখী কর্মজীবন, নানা

বিরুদ্ধতায় আক্রান্ত আত্মশক্তির ঘাতপ্রতিঘাত, অপরিমেয় দান ও পরহিতাকাঙ্ক্ষা, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি আর সেবাযত্নে সতত তৎপর, অদ্ভুত ঘটনাচক্রে বীরসিংহ পরিত্যাগ, ভদ্রসমাজে শঠতা এবং অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়ায় সরল সাঁওতাল জীবনে অকপট ঘনিষ্ঠতার আশ্রয়—এসব মিলিয়ে বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় জীবন আলেখ্য। প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিত্ততায় বিদ্যাসাগরের আজীবন বৈশিষ্ট্য। এখানে পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের উত্তরাধিকার বর্তেছে এমন কথা কোনো কোনো আলোচনায় উঠেছে।

তবে যেখানে বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট তা হলো সমাজে সংসারে বাস্তবধর্মিতা থেকে তিনি সহসা বিচ্যুত হতেন না। রামজয় তো পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধে মাঝে মাঝে সংসার ত্যাগ করতেন। তখন তাঁর স্ত্রী দুর্গা দেবীকে নিদারুণ কষ্টে কয়েকটি সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে হয়। তেমন অবস্থাতেই তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস চাকুরির খোঁজে কলকাতায় আসেন। আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকে বিদ্যাসাগর কখনও ইহজীবনের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হননি। আর সেই দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে উদার ও বিস্তৃত ছিল তাঁর পরার্থচিন্তার গভীরতা। দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার দর্শন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের নিরন্তর আগ্রহও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আত্মস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনচিত্ততা এবং ঐহিক কর্তব্যনিষ্ঠার যোগসাজশেই বিদ্যাসাগরের স্বরূপনির্ণয়ে পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয়ও অবান্তর নয়।

ইংরেজিপনায় আসক্ত কোনো আধুনিকতা অবশ্য বিদ্যাসাগরের নির্বিচার প্রশ্রয় পায়নি। পোশাকে পরিচ্ছদে, আহারেবিহারে তিনি পুরোপুরি দেশী লোক। কলকাতায় আপন বাসস্থানের নক্সায় ইংরেজি ধরনের আদল ছিল। আবার ফরাসে বসা অপছন্দ করতেন। চেয়ারে বসে কথাবার্তা ছিল বিদ্যাসাগরের পছন্দ। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় উৎসাহী মানুষ বিদ্যাসাগর। ইংরেজ শাসনের কোনো বিকল্প-ভাবনা তাঁর চিন্তায় প্রকাশ পায়নি। সমাজসংস্কারের অনুকূল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিচারে হিন্দু সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল। তবে সেই সঙ্গে ইংরেজ শাসনে আরব্ধ আইন ব্যবস্থার যোগাযোগ আছে। কারণ ধর্মশাস্ত্রের বিচারবিবেচনা ছাড়া হিন্দু আইনে কোনো পরিবর্তন ইংরেজ শাসকদেরও নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

রাজশক্তির সাহায্য সমর্থন নিয়েই বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের কথা ভাবতেন। ১৮৯১তে সহবাস সম্মতি আইন সংক্রান্ত সুপারিশে বারো বছরের কমবয়সী মেয়েদের বিবাহ সম্পূর্ণ (স্বামী স্ত্রীর প্রথম যৌন সংগম) হওয়ার সম্বন্ধে সরকারি,

নিষেধপ্রস্তাব বিদ্যাসাগর সমর্থন করেননি। তবে নিজের বিচারসম্মত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনে রাজকীয় দণ্ডবিধির প্রয়োগ তিনি সমর্থন করেন। তখন কিন্তু দেশীয় প্রজাদের ঘরে সংসারে আচারবিচারের সামাজিক পরিসরে রাজশক্তির হস্তক্ষেপ না হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে। বিদ্যাসাগর অবশ্য সমাজসংস্কারের সব প্রস্তাবেই রাজশক্তির সমর্থন ও হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন।

ইংরেজ রাজশক্তি, অন্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর কখনও আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত, বা শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং, কারও ক্ষেত্রেই নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মতো কাজকর্মে ওপরওলার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেন না। জন-সমাজের দায় এবং কর্তব্য বিধবাবিবাহ। সে কর্তব্যে অবহেলা সামাজিক দায়িত্ব-শূন্যতার পরিচয়। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বিপুল ঋণ বিদ্যাসাগরের হয়েছিল। তাঁকে ঋণমুক্ত করতে হিন্দু পেট্রিয়টের জনআবেদন প্রত্যাহার করবার কথা বলেন বিদ্যাসাগর। জনহিতৈষিতায় নিবিষ্ট বিদ্যাসাগর তাঁর সামাজিক প্রকল্পের জন্য ব্যক্তিগত ঋণের বোঝা নিজেই বহন করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর আরব্ধ প্রকল্পে সহায়তার সামাজিক গুরুত্ব আলাদা। সেখানে নিরুদ্যম অসহযোগিতাই বিদ্যা-সাগরের ঋণের কারণ। তা শোধ করতে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করায় তো ব্যক্তিগত অনুকম্পার কথা এসে পড়ছে। তা গ্রহণে বিদ্যাসাগর নারাজ।

আগেই বলেছি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের কোনো ভূমিকা আমাদের চোখে পড়ে না। তার সঙ্গে অবশ্য স্বদেশের সম্পর্কে কোনো হীনমন্যতা জড়িত নয়। মার্শম্যানের বই থেকে অনুবাদ বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস'। পলাশী বা বক্সার যুদ্ধ প্রসঙ্গে ইংরেজ পক্ষে ষড়যন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ মার্শম্যানে নেই। বিদ্যাসাগর কিন্তু লেখেন তেমন ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতিরেকে ইংরেজদের উভয় যুদ্ধেই জয়লাভ দুষ্কর ছিল। আবার নন্দকুমারের বিচারে ইম্পে এবং হেস্টিংসের ক্রূর শঠতার কথা বিদ্যাসাগর লেখেন। মার্শম্যানের বইতে কেবল নন্দকুমারের নিন্দা ছিল। (Sen 1977 : 137)

বিখ্যাত এক উক্তিতে মাইকেল বলেছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্তর মাতৃহৃদয়ের করুণা ও মমতায় পূর্ণ। বাইরের জনসমাজের বিস্তৃত বিচিত্র কর্মকাণ্ডে কীর্তিমান অগ্রগণ্য মানুষ বিদ্যাসাগর। যৌক্তিকতার অবলম্বনে সর্বদা গ্রথিত তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং কাজকর্ম। লোকহিতৈষিতার পর্যাপ্তিতে কিন্তু বিদ্যাসাগর খুঁটিনাটি যুক্তিবিচারের পরোয়া করতেন না। তখন যেন পুরো জনসমাজটাই তাঁর জীবন-

যাত্রার অন্দরমহলে পরিণত হয়ে যায়। অন্দরের মতো নিকটজনের ব্যাকুলতা ও হিতকর্ম! পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসায়ে মুনাফার প্রতি মনোযোগে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। আবার অর্জিত অর্থে দান ও পরোপকারের অন্ত থাকেনি,। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথায়,

> ...বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণা-সুন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবা মাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায় তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবা মাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। (রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী ১৩৫৬ ব. : ১৮৬-৭)

দেশোন্নতির লক্ষ্যে নিবিষ্ট ছিলেন বিদ্যাসাগর। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে তেমন উন্নতির কোনো বিরোধের চিন্তা তাঁর ধারণায় স্থান পায়নি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্ভব হতে পারে, তদনুরূপ বাংলা ভাষার বিকাশ ছিল বিদ্যাসাগরের বিশেষ অভিপ্রায়। তার জন্য সমুচিত সংস্কৃত জ্ঞান অপরিহার্য। 'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র মতো সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার সরল গ্রন্থ রচনায় বিদ্যাসাগর সেই কর্তব্য সহজসাধ্য করতে চান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার প্রয়োজনকে বিদ্যাসাগর অগ্রাধিকার দেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্যোগ ও তৎপরতায় বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হবে, এমন ছিল বিদ্যাসাগরের পরিপ্রেক্ষিত। আজীবনের অভিজ্ঞতায় ব্যর্থতার আঘাত তিনি কম

পাননি। সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় তেমন ব্যর্থতার ভাগ অনেক বেশি।

তবে দরিদ্র সংসারের অগণিত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে কীর্তি ও গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের চরিতকথা আমাদের আধুনিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় আলেখ্য হয়ে আছে। অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জীবনভর বিদ্যাসাগরের সফল বিফল সব প্রচেষ্টা এক বিরল আত্মশক্তির নিদর্শন। ঔপনিবেশিক গৌণতায় আচ্ছন্ন আমাদের উনিশ বিশ শতকের ইতিহাসে তা এক মহৎ ব্যতিক্রমের মর্যাদায় অভিষিক্ত। আবার লোকহিতৈষিতায় সতত তৎপর বিদ্যাসাগরের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যে তিনি যেন চারপাশের নানা প্রতিবন্ধ থেকে মুক্তি চান। লোকহিতৈষিতার নির্বিকার পর্যাপ্তিতে ওই সমাজের কোনো বাঁধাধরা মাপকাঠি বিদ্যাসাগরকে নিরস্ত করতে পারে না। তেমন বৈশিষ্ট্যের আবেদনে আমরাও এক নিঃসহায় অবরোধ থেকে মুক্তির সান্ত্বনা খুঁজে ফিরি। তেমন জীবন নিয়ে কথার শেষ নেই, উপকথারও। বিদ্যাসাগর বলেই তো কথা উপকথার এত প্রাচুর্য। তাদের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যাসাগর জীবনবৃত্তান্তের ভিতরে বাইরে অবিচ্ছেদ্য সত্যের ব্যঞ্জনায় গ্রথিত।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিভ্রান্তি

আকাদেমি পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় (জুলাই ১৯৯৫) 'বিভ্রান্তিবিলাস : সহবাস সম্মতি আইন ও বিদ্যাসাগর' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পড়লাম। (বিজিতকুমার দত্ত স. ১৯৯৫ : ৩২৯-৫২) লেখক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দেখলাম আমার বইয়ের (*Iswar Chandra Vidysagar and His Elusive Milestones*) একটি পৃষ্ঠায় তিনি 'বিভ্রান্তি' আবিষ্কার করে নানা কথা লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের কাছে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি। প্রায় কুড়ি বছর (১৯৭৭) আগে আমার বইটির প্রথম প্রকাশ। অনেকদিন বইটি বাজারে নেই। গত পনেরো-কুড়ি বছরে উনিশ শতকের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি নিয়ে প্রচুর নতুন অনুসন্ধানের কাজ দেশবিদেশে হয়েছে। তার থেকে আমার চেনাজানাও বেশ উপকৃত। নতুন যতটা শিখতে পেরেছি তার সাধ্যমতো সংযোজনে আমার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা উচিত ছিল। বিলম্বের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। সেই কাজের মধ্যেই থাকবার চেষ্টা করি।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখাটি অবশ্য তেমন নতুন গবেষণাকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। লেখাটির উল্লেখপঞ্জিতে (ক্রমিক নং ৩৮) মীরা কোশম্বির একটি প্রবন্ধের কথা তিনি বলেছেন। তবে নিছক তিলক আর ভাণ্ডারকরদের মধ্যে বিতর্কের কথা ছাড়া আর খুব কোনো প্রসঙ্গ সে প্রবন্ধ থেকে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আলোচনায় আসেনি। যাই হোক বক্তব্যের যে সীমা তিনি বেঁধে দিয়েছেন, তার মধ্যেই আমার এই আলোচনা ধরে রাখবার চেষ্টা করব।

পরম্পরা, অগ্রাঘাত

বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' বইয়ের একটি প্রশ্ন—বিদ্যাসাগর 'কেন "বাল্যবিবাহ" আইনের দ্বারা নির্মূল করতে চাইলেন না'—সম্বন্ধে রামকৃষ্ণবাবু লিখেছেন, 'উদ্ভট, যাকে বলে howler'। কারণ লেখকের মতে

'বিষয়টি বিবাহ নয়, বলাৎকার'। আমার বইয়ের একটি বাক্যেও রামকৃষ্ণবাবু অনুরূপ বিভ্রান্তির পরিচয় পেয়েছেন। বাক্যটি হল, 'In any case, compared to his earlier position on *Balyabibāher Dos*, Vidyasagar narrowed his grounds of opposition to child marriage'। রামকৃষ্ণবাবু লিখেছেন 'বিদ্যাসাগরের "মন্তব্য"য় "বাল্যবিবাহ" নিয়ে একটি কথাও নেই।' 'মন্তব্য' বলতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নির্দেশিকা ১৮৯১-র সহবাস সম্মতি বিল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সুপারিশ।

উদ্ভট কি উদ্ভট নয় সে কথায় পরে আসছি। আমার লিখিত বাক্যটির বাংলা মানে এরকম—যাই হোক 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটির তুলনায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে নিজের যুক্তির পরিধি তিনি (বিদ্যাসাগর) সংকীর্ণ করলেন। এতে রামকৃষ্ণবাবুর ঘোরতর আপত্তি।

সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রবন্ধ 'বাল্যবিবাহের দোষ'। ১৮৫০-এ প্রকাশিত। তার আরম্ভ,

> অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতা-মাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।
>
> ইহাতে এ পর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সজ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশলে এমত কঠিনতর অধর্ম-ভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কূলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্ত-পুরুষ পর্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা-মাতা যাবজ্জীবন অশৌচ-গ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।
>
> ইহাতে যদিও কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না।

১৮৯১-তে সহবাস-সম্মতি বিলটির সম্পর্কে নিজের সুপারিশ বিদ্যাসাগর এই বলে করেন (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের তর্জমা),

এই বিলটিকে আমি নিঃশর্ত সমর্থন জানাতে অপারগ। এটি আইন (act)-এ পরিণত হলে, যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীরা বারো বছর বয়স হওয়ার আগে ঋতুমতী হবে, তাদের গর্ভাধান অনুষ্ঠানে এটি বাধা দেবে। গর্ভাধান একটি অনুষ্ঠান যা অবশ্যকৃত্য ও বাংলায় সাধারণভাবে পালিত হয়। স্ত্রীর প্রথম ঋতুদর্শন হলে স্বামীকে এটি করতেই হয়।

তারপর 'কলিযুগের পক্ষে বিশেষ মান্য' পরাশরের বচন উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর 'গর্ভাধান' সংস্কারের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেন এবং শাস্ত্রীয় ভাষ্য থেকে সেই ধর্মীয় আচারের বিবরণ দেন। বারো বছরে সহবাস-সম্মতির ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের পরিবর্তে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব, স্ত্রীর প্রথম ঋতুর আগে পুরুষের পক্ষে বিবাহ সম্পূর্ণ করা (=প্রথম সহবাস) একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে। হিন্দু শাস্ত্রমতে স্ত্রী ঋতুমতী না হলে স্বামীকে বিবাহ সম্পূর্ণ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

'ব্যল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে 'কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিণী' হওয়ার শাস্ত্রীয় নিষেধ এবং বিভীষিকার কঠোর সমালোচনা করেন বিদ্যাসাগর। আর ১৮৯১-এর সুপারিশে 'গর্ভাধান'-এর ধর্মীয় আচারে কোনো হস্তক্ষেপ তিনি সমর্থন করতে অপারগ। এখানেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তির পরিধি সংকীর্ণ হয়ে যায়। রামকৃষ্ণবাবু বলেছেন, সহবাস-সম্মতির ব্যাপারটা বালস্ত্রী সম্পর্কিত, সেখানে বাল্যবিবাহের কথা তোলা অবান্তর। প্রথম ঋতুকালে গর্ভাধান বিধেয় হলে তো তার আগেই বালিকার বালস্ত্রী হওয়া আবশ্যক। 'গর্ভাধান' সংস্কার পালনে পতির পক্ষে যা বিধেয়, অবিবাহিতা বালিকার অভিভাবকদের পক্ষে তার পরিপূরক কর্তব্যও পরাশর সংহিতায় নির্দিষ্ট ছিল। 'বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তক'টিতে বিদ্যাসাগরের নিজের অনুবাদ থেকে ওই প্রকরণের পূর্বাপর আমরা জানতে পারি—

> অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী বলে; নববর্ষা কন্যাকে রোহিণী বলে; দশবর্ষীয়া কন্যাকে কন্যা বলে; তৎপরে, অর্থাৎ একাদশাদি বর্ষে কন্যাকে রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, যে কন্যাদান না করে, তাহার পিতৃলোকেরা মাসে মাসে সেই কন্যার ঋতুকালীন শোণিত পান করেন। কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনজনে নরকে যান। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য, অপাঙ্‌ক্তেয় ও বৃষলীপতি, অর্থাৎ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই, এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন

করিতে নাই, এবং তাহার সেই স্ত্রীকে বৃষলী বলে। যে দ্বিজ এক রাত্রি বৃষলী সেবন করে, সে তিন বৎসর প্রতিদিন ভিক্ষান্ন-ভক্ষণ ও জপ করিয়া শুদ্ধ হয়।

শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রয়োগে অগ্রাঘাত, pre-emptive move-এর কথা রামকৃষ্ণবাবু যা বলেছেন তার দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডে নিশ্চয় আছে। ১৮৯১-এর সহবাস-সম্মতি বিলটি সম্বন্ধে তাঁর সুপারিশে কিন্তু ব্যাপারটা উল্‌টে যাচ্ছে। বারো বছর বা তার বেশি বয়সী মেয়েদের কথা বিবেচনা খুবই সংগত। তার জন্য এমন সুপারিশ হতে পারত যে বারো বৎসর পূর্তি অথবা রজোদর্শনের পূর্বে (যা পরে ঘটবে তাই প্রযোজ্য) বালস্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সহবাস স্বামীর দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। 'whichever is later' তো আইনের একটি সুপরিচিত বয়ান। বিদ্যাসাগর তেমন সুপারিশ করেননি। এক্ষেত্রে তাঁর মতামত পরাশরের বিবাহবিধায়ক বচনকেই জোরদার করছে, 'অষ্টম, নবম, দশম বর্ষে কন্যা দান করিবেক।' পরাশরমতে বালস্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হলেই 'গর্ভাধান' বিধেয় এমন সংস্কারকে দশ, এগারো, বা তারও কম বয়সী কন্যাদের বিবাহের বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

বিরল হলেও দশের চেয়ে কম বয়সী বালিকার 'রজস্বলা' হওয়ার দৃষ্টান্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আছে। তাই বিদ্যাসাগরের সুপারিশমতো কলির বিধায়ক পরাশরকে অনুমোদন করলে, মার্কণ্ডেয় বর্ণিত কলিযুগের বিভীষিকাও ন্যায়সম্মত হয়ে পড়ে। যুধিষ্ঠিরকে মার্কণ্ডেয় বলছেন, 'কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গর্ভবতী হইবে, পুরুষগণ দশ বা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে পুত্রোৎপাদন করিবে এবং মনুষ্যগণ ষোড়শবর্ষেই জরাগ্রস্ত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই করাল কালকবলে নিপতিত হইবে।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত 'মহাভারত', বনপর্ব, ১৮৮ অধ্যায়)

এ তো পৌরাণিক অতিকথা! বিদ্যাসাগরের চারপাশের সমাজে ফুলমণির ভয়ংকর মৃত্যুর ঘটনা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বালস্ত্রীদের ওপর তেমন অত্যাচারের আরও ঘটনা পত্রপত্রিকায় জানা যেত। সেসব ক্ষেত্রে বালিকাদের বয়স বারোর নীচেই ছিল। তৎকালীন নানা বিবরণ থেকে মনে হয় ফুলমণির বয়স সাড়ে দশ বছরের মতো। তবে ১৯৫৫-তে প্রকাশিত মোদির 'Medical Jurisprudence' বইটিতে (দ্বাদশ সংস্করণ) মামলাটির সংক্ষিপ্ত টীকায় ফুলমণির বয়স রয়েছে ১১ বছর ৩ মাস। ইংরেজ শাসকবর্গ চিকিৎসকদের রিপোর্টের

ভিত্তিতে স্থির করেন যে এদেশে সর্বাধিক সংখ্যক বালিকা বারো বছর নাগাদ ঋতুমতী হয়। ওই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত সংশয়াতীত নয়। বিদ্যাসাগর ঠিকই বলেন যে বারো বছর বা তার বেশি বয়সে যে বালস্ত্রীরা যৌবনে উপনীত হবেন, তাঁদের জন্য বিলটিতে কোনো প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তাঁর সুপারিশে তো আবার বারোর চেয়ে কমবয়সী রজস্বলা বালস্ত্রীদের কোনো প্রতিরক্ষার উপায় থাকছে না।

ফুলমণির মৃত্যু বা অনুরূপ আরও দুর্ঘটনায় 'ফুলমণিরা' রজস্বলা ছিল কি ছিল না, সে প্রশ্ন অবান্তর। গর্ভাধানে মৃত্যু না হলেও তেমন বালিকাদের গর্ভ-ধারণে মৃত্যুর আশঙ্কা কম নয়। তা নিয়ে বাল্যবিবাহের সমালোচনা বিদ্যাসাগর নিজেও তার ১৮৫০-এর প্রবন্ধে করেছিলেন। ১৮৮১-র সেন্সাস তথ্যের ভিত্তিতে রিসলির অনুমানমতো বঙ্গদেশে বিয়ের সময় মেয়েদের গড় বয়স দশ বছরের খুব বেশি ছিল না।

স্মৃতিশাস্ত্র বিচারে ভুল ঠিক নির্ণয়ের বিন্দুমাত্র সাধ্য আমার নেই। তবে পুনের অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, আইনজীবী, বিচারক এবং হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ তেলাঙ, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংশ্লিষ্ট রামনাথ তর্করত্ন প্রমুখ অনেকের বিশ্লেষণ পড়বার সুযোগ পেয়ে মনে হয় পরাশর বচন এবং 'গর্ভাধান' সংস্কার সমেত শাস্ত্রীয় পরম্পরার এমন ব্যাখ্যাও সম্ভব ছিল যাতে বালস্ত্রীরা রজস্বলা হলেই 'গর্ভাধান' সংস্কার প্রযোজ্য নয়। ঋতুমতী হলেই নিতান্ত কম বয়সের মেয়েরা প্রথম সহবাসের উপযুক্ত হয়েছে, এমন সিদ্ধান্তের সমর্থন বহু শাস্ত্রবচনে ছিল না, আয়ুর্বেদে তো নয়ই।

আর রজোদর্শনের পূর্বে বালস্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে ঠিক কোনো শাস্ত্রীয় অগ্রাঘাতের নিদর্শন নেই। রামকৃষ্ণবাবুও জানেন, এই শাস্ত্রনির্দেশ 'চ্যাম্পিয়ন গর্ভাধানিস্ট' শশধর তর্কচূড়ামণিও অস্বীকার করেননি। তবে এবিষয়ে কোনো আইনের প্রয়োজনই তিনি সম্ভবত মানতেন না। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী! এই পার্থক্যে শাস্ত্রবিচারের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন জড়িত। বিদ্যাসাগর যেমন রাজনীতির লোক নন, তেমনি তাঁর নিজের একটা রাজনীতিও ছিল। সে কথায় পরে আসছি।

রামকৃষ্ণবাবু যে পরম্পরার কথা তুলেছেন তার তো শাখাপ্রশাখা অনেক এবং বহুবিচিত্র মিশ্রণের অন্ত নেই। 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর যখন স্বয়ংবরের উল্লেখ করেছেন সে তো পুরাণ, মহাকাব্য, নাট্যসাহিত্যের পরম্পরায়

সংশ্লিষ্ট। যে অনুষঙ্গে, যে ব্যঞ্জনায় বিদ্যাসাগর স্বয়ংবরপ্রথাতে ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত দিলেন তাতে ইচ্ছা, সব্যবস্থা এবং শৌর্যশুল্ক তথা পুরাণে কথিত তিনরকম স্বয়ংবরই নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি পাচ্ছে। স্মৃতিশাস্ত্রে স্বয়ংবর মনে হয় অরক্ষণীয়া কন্যার স্বেচ্ছায় পতি নির্বাচনের অধিকার। কিন্তু সে অধিকারে জড়িয়ে থাকে কন্যাদানের অক্ষমতায়, লজ্জা ও গ্লানিতে বিপন্ন পিতার অবমাননা। (Jolly 1928 : 111-12, f. n. 2) অস্বীকার করছি না, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ভেদাভেদ এবং নানা খুঁটিনাটি বিচারের কূট তর্কে তাকে স্মার্ত পরম্পরাতেও মেলানো অসম্ভব নয়।

কিন্তু পতির খোঁজে সাবিত্রীর দেশে দেশে পরিভ্রমণ, নল-দময়ন্তীর পূর্বরাগ, আজন্ম যুবতী দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, সুভদ্রাহরণ ইত্যাদি আখ্যানের যে অমিত ঐশ্বর্য তা স্মৃতিশাস্ত্রের পরিসীমায় আবদ্ধ থাকে না। অধ্যাপক কানে ভবভূতির নাটকে নায়িকা মালতী এবং 'হর্ষচরিত্রে' রাজ্যশ্রীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। আর 'সংস্কার-প্রকাশ'সূত্রে এই কথাও আছে, 'there is no prohibition against marrying a girl who has passed the age of puberty for kṣtriyas and others.' (Kane 1974 : 446) 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর আদৌ পরাশর-কথিত স্মার্ত পরম্পরা অনুসরণ করেননি।

রামকৃষ্ণবাবু লিখেছেন এতে সমাজের গায়ে আঁচড় কাটা অসম্ভব বুঝে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় সমাজ সংস্কারের যুক্তিবিন্যাসে তৎপর হলেন। শাস্ত্র বহুজনের বিশ্বাসের আকর তা ঠিক। এক্ষেত্রে কিন্তু সেই 'বহুজন' হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণভুক্ত কুড়ি শতাংশের বেশী নয়। যে 'বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন' তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' সেই আইনের একতিয়ার সকল হিন্দুর পক্ষে কতটা প্রযোজ্য তা নিয়ে তো মামলা মোকদ্দমার অবধি ছিল না। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারবৈষম্যে এমন প্রশ্নও মোটেই অবান্তর নয় যে আশি শতাংশ নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে আইনটি কি বিধবাবিবাহের অনুকূল হয়েছিল? সম্পত্তি আর সতীত্ব নিয়ে সেসব বাদপ্রতিবাদের আলোচনায় এখানে ঢুকছি না।

অন্যপক্ষে উচ্চবর্ণের আবেষ্টনে যে পরিপার্শ্ব তার পর্যাপ্ত আনুকূল্যও বিদ্যাসাগর পেলেন না। নির্ভীক সেই পরিক্রমায় পদে পদে বাধা বিপত্তি, বঞ্চনা আর মিথ্যাচারে পর্যুদস্ত বিদ্যাসাগর একবার বলেছিলেন, তাঁর দেশের লোক এত নিষ্কর্মা ও অপদার্থ জানলে তিনি কখনোই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, শাণিত যুক্তিবুদ্ধি এবং নিঃস্বার্থ অর্থব্যয়ে যে

মহত্ত্ব আর পৌরুষের পরিচয় আমরা পাই, এমন অভিজ্ঞতা তাকে গৌণ করতে পারে না। সেখানেই আবার প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য এবং নতুন সামাজিক কর্তব্য প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের বিচার একটা সংগতি পেয়ে যায়।

পরম্পরার অঙ্গীকারে ব্যক্তির নির্বাধ স্বাধীনতা দুষ্কর। বিদ্যাসাগরও নিজের পটভূমিতে সন্নিবদ্ধ ছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেক অবলম্বনও যথাযোগ্য শ্রেণীপ্রাধান্যের সহযোগে সমাজসংস্কৃতির রূপান্তরে সহায় হতে পারে। পেত্রার্ক থেকে ইরাসমাস পর্যন্ত রেনেসাঁস মানবতার ইউরোপীয় পরিক্রমায় তার অনেক নজির আছে, যেমন আছে লুথার, ক্যালভিনের রিফর্মেশনে, বা কিছুটা অন্য-প্রকারে ক্রমওয়েল বিজয়ের ঠিক আগে ইংল্যাণ্ডে এডওয়ার্ড কোকের আইন নিয়ে পুরাকথা নির্মাণে যাতে প্রাচীন 'ম্যাগনা কার্টা' হয়ে পড়ে অর্থ নৈতিক স্বাধিকারের সনদ। এসব কথার কিছুটা আলোচনা আমার বইটিতে ছিল। (Sen 1977 : 66-89)।

তবে ভিনদেশী বিশেষত ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে উনিশ শতকের বাংলায় পরম্পরার অনুসন্ধান বড় একটা এগোয় না। অথচ সে সন্ধানের দরকার খুব বেশি। সেদিন তো ছিলই। আজও কম নয়। সেখানে ব্রাহ্মণ্যচিন্তার প্রতাপেই সব কথা নেই। হিন্দু সমাজের কেন্দ্র ও প্রান্তবর্তী স্তরে স্তরে লোকায়ত এবং ব্রাহ্মণ্যের বহুবিচিত্র মিশ্রণকে সরলীকরণের কোনো সমর্থন জীবনের বাস্তবতায় নেই। আবার নিছক ব্রাহ্মণ্যের অনুশাসনেও কত জটিলতা! সেখানেও লোকায়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কোনো-না-কোনো যোগ-বিয়োগ কখনোই অসম্ভব নয়। জটিলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ পরাশরকেই ধরা যাক। তাঁকে কলিযুগের বিধায়ক মান্য করলে তা বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল। পরাশর সংহিতার বিধানে আবার মেয়েদের বাল্যবিবাহ এক অপরিহার্য কর্তব্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এক বক্তৃতায় বলেন (Hindu Marriage 1887 : 67-68) :

> কিন্তু যিনি কলির ব্যবস্থাপক, যিনি কলিযুগের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি সম্মতিপূর্ব্বক বিবাহের নামও করেন নাই, গন্ধও করেন নাই।...আট বৎসরের পূর্ব্বে না হয় অথচ যত অল্পবয়সে বিবাহ হয় ততই ভাল...

অধ্যাপক কানের ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং সমাজবিশ্লেষণের (Datta 1944 : 175-201) প্রসঙ্গে মনুস্মৃতির বিচার মিলিয়ে ভাবা যায় এতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শক্তির জেহাদ ঘোষিত হচ্ছে। আবার বাংলার বৌদ্ধ প্রভাব বা

পরম্পরার কথায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বহু আলোচনাতেও ব্রাহ্মণ্যবিরোধী জনবৃত্তের ভূমিকা অস্পষ্ট নয়। (সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ স. ১৯৮৪ : ৩৬-৩৭) মনুস্মৃতির সময় থেকে অন্তত তিন শতাব্দী পরে, ছয় শতাব্দীও হতে পারে (কানে লিখছেন খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে) বাল্যবিবাহের ঝোঁক বাড়ছে। হতে পারে তা বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের জীবনে নৈতিক শৈথিল্যের প্রতিক্রিয়া। (Kane 1974 : 443)

পরাশর স্মৃতি সম্পর্কে এমন মন্তব্যও আছে যে তখন ভারত ইতিহাসের আদিপর্বের ভাঙন শেষ হয়ে আসছে (Datta 1944 : 175-201)। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে হর্ষবর্ধনের সমকালীন এবং পরবর্তী হিন্দু রাজ্যসমূহে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা এবং অঞ্চলে অঞ্চলে শাসন আর সমাজের ভাঙাগড়ার কথা ইতিহাসে সুপরিচিত। সামাজিক ইতিহাসের চেনাজানা আরও পরিণত হলে সমাজসংস্কারের পরম্পরা বিচারে একটি প্রশ্নের (Kapadia 1958 : 142-43) উত্তর মিলতে পারে। প্রশ্নটি হল, মনুস্মৃতির পাঁচ-ছ'শো বছর পরে পরাশর-কথিত বাল্য-বিবাহের বিধান কেন এত গুরুত্ব পাচ্ছে?

এসব প্রশ্নে, কথায় কোনো কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের নির্দিষ্টতা নেই। উদ্দেশ্য তা নয়। পরম্পরার জটিল সংমিশ্রণ, তার অন্তরে অন্তরে বিচিত্র সব ভাঙাগড়ায় নানা দ্বন্দ্ববিরোধ, নিষ্পত্তির সম্বন্ধে উন্মুক্ত দৃষ্টি ও উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। যেমন জাতকের জীবনবাস্তবতায় মনুস্মৃতির বর্ণভেদে অবরুদ্ধ সমাজের পরিচয় নেই। কোশম্বির আলোচনায় তা সাতবাহন রাজত্বের সমকালীন বলা হচ্ছে। মৌর্যদের সময়ে, জাতকে সতীদাহের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। গুপ্তযুগের আগে পুনর্লিখিত মহাভারতে সেই প্রথার সমর্থন আছে। গুপ্ত আমলে কিন্তু কোনো রানীর সতীদাহের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। বরং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিধবা রানী ছেলের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য নির্বাহ (regent) করছেন। হর্ষের মা সতী হলেও, তাঁর বিধবা ভগ্নী রাজশ্রীকে হর্ষই সতীদাহ থেকে নিবৃত্ত করেন। ভগ্নীর মৃত পতি গ্রহবর্মনের সিংহাসনে যুগ্ম অধিকার পেলেন রাজশ্রী ও হর্ষবর্ধন (Kosambi 1975 : 227-307)।

পরম্পরার প্রশ্নে আর একটি ব্যাপার উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। সহবাস-সম্মতি আইন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে প্রযোজ্য, এই কথায় রামকৃষ্ণবাবু সঠিক জোর দিয়েছেন। সেই অনুসঙ্গে রাষ্ট্র এবং আইনের পরম্পরায় নিশ্চয় মোগল বাদশাহ আকবরের একটা স্থান থাকা সমীচীন। আকবরের অনুশাসনে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিধানের জায়গায় পুরুষের

নিম্নতম বিবাহের বয়স ষোল এবং মেয়েদের চোদ্দ বছর ধার্য হয় (Sarkar 1984 : 177)। বাধ্যতামূলক সতীদাহ প্রথাও নিষিদ্ধ হলো, স্বেচ্ছায় সতী হওয়া যেত। এমন পরম্পরার বিশিষ্ট স্বীকৃতি অন্তত একটি বইতে (T. N. Mukharji 1890 : 5-6, 29) পেয়েছি। ফুলমণির নিষ্ঠুর মৃত্যুতে বইটি লেখকের প্রতিক্রিয়া '...we are for penalising the marriage of girls before the age of twelve. That too should be the age of of consent between husband and wife ; for others it should be sixteen'. (*ibid*), অর্থাৎ তিনি মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়স বারো বছরে ধার্য করার পক্ষপাতী, সেটাই হওয়া উচিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সহবাস-সম্মতির নিম্নতম বয়স ; আর দাম্পত্য সম্বন্ধ না হলে সহবাস-সম্মতিতে মেয়ের ন্যূনতম বয়স ষোল বছরে ধার্য হবে।

খুবই অল্প হলো আমার এই পরম্পরার বিবরণ। তার মর্মে মর্মে আরও অনেক বৈচিত্র্য, প্রচুর টানাপড়েন কালের ধারায় বহুরূপে প্রকাশ পায়। প্রতিভার 'শাণিত যুক্তি বুদ্ধি' যত প্রখরই হোক, এমন সব দ্বন্দ্বের বোঝাপড়ায় তার সঙ্গে সমকালীন অভিপ্রায়ের সংগতি নিছক নৈয়ায়িক আয়ত্তে না থাকতে পারে।

আইন বিভ্রাট

রামকৃষ্ণবাবু লিখেছেন ফৌজদারি দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত সহবাস-সম্মতি আইনটি বলাৎকারের অপরাধ-সম্পর্কিত, তার সঙ্গে বাল্যবিবাহের কোনো যোগাযোগ নেই। ১৮৬০-এর দণ্ডবিধিতে সেই ধারায় পাঁচ রকম বলাৎকারের কথা রয়েছে : (১) কোনো মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার ; (২) বিনা সম্মতিতে কোনো মেয়ের সঙ্গে যৌন সংগম ; (৩) আইনত স্বামী নয়, অথচ স্বামীর ছল করে কোনো মেয়ের সঙ্গে যৌন সংগম ; (৪) কোনো মেয়েকে মৃত্যুভয় বা আঘাতের ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে যৌন সংগম ; (৫) সম্মতি থাক বা না থাক, দশ বছরের কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে যৌন সংগম। [পাঁচটি রকমের মধ্যে একমাত্র দশ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংগমেই স্বামীর পক্ষে (দাম্পত্য সম্পর্কে) বলাৎকারের অপরাধ বলে গণ্য হবে।] এই পাঁচের ধারাটিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্ত্রীর বয়স দশ বছরের কম হলে তার সঙ্গে যৌন সংগম স্বামীর পক্ষে বলাৎকারের অপরাধ। তা হলো 'বৈবাহিক বলাৎকার' (marital rape)।

সেই সূত্রে সহবাস-সম্মতি আইন বাল্যবিবাহের সঙ্গে সংযুক্ত। ১৮৯১-তে ন্যূনতম বয়সকে বারো বছর পর্যন্ত বাড়াবার প্রস্তাব এল।

হিন্দুবিবাহ একটি শাস্ত্রসম্মত ধর্মীয় সংস্কার (sacrament)। যত কম বয়সই হোক বিবাহের কোনো বাধা নেই। বিবাহ এবং বিবাহসম্পন্ন (স্বামী-স্ত্রীর প্রথম যৌন সংগম) হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্ভব। স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনের পূর্বে তেমন সহবাস শাস্ত্রে বিধেয় নয়। এমন ব্যবস্থায় কুমারী কন্যার সত্বর বিবাহের সঙ্গে পুণ্যার্জনের ধারণা জড়িয়ে বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব। এই সমস্যা বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই উল্লেখ করেছিলেন। আবার ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত যে বিবাহের প্রত্যয় ও প্রকরণ তার বয়স নিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ সেদিনের রাষ্ট্রে আর সমাজে সম্ভব হয়নি।

তাই সহবাস-সম্মতির ন্যূনতম বয়স বেঁধে 'বৈবাহিক বলাৎকার' নিবারণের চেষ্টা হয়েছিল। দুটি কথা বোঝা কঠিন নয় যে এতে 'বিবাহিতা কুমারী' কন্যার সঙ্গে স্বামীর যৌন সংগমের আশঙ্কা কমছে আর পরোক্ষ প্রভাবে এই আইনে অন্তত মেয়েদের সহবাস-সম্মতির ন্যূনতম বয়সের নীচে বাল্যবিবাহের প্রচলন কিছুটা কমবে। ভুলবার নয় যে ১৮৬০-এর ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে বলাৎকার নির্ধারণে সহবাস-সম্মতির ন্যূনতম দশ বছর বয়স সম্পর্কে শর্তটির অন্তর্ভুক্তিতে বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন উদ্যোগী মানুষ।

বিশিষ্ট পর্যবেক্ষকের কথায়, '…it did pave the way for fixing the age of marriage at a later date. The law of rape posed for the first time the problem of infant marriage in its grim reality.' (Kapadia 1955 : 147) অর্থাৎ এই আইন বিয়ের বয়স বাড়ানোর উপায় করে দেয়। বলাৎকারের আইন বাল্যবিবাহের ভয়ানক বাস্তবিক সমস্যা প্রথম দর্শালো। আর উল্লিখিত 'বিবাহিতা কুমারী' কথাটিতে কোনো আলংকারিক বিরোধাভাস নেই। কুমারী পূজার আচারব্যবস্থা আমাদের পরিচিত। তেমন 'কুমারী' অবস্থায় বিবাহবন্ধনের আশঙ্কাই এখানে প্রাসঙ্গিক।

তবে কি আর বিনয় ঘোষের সেই প্রশ্নকে আমরা নিছক উদ্ভট howler বলে উড়িয়ে দিতে পারি? ১৮৯১-তে সহবাস-সম্মতির শর্ত সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সুপারিশে সে আইনের বাল্যবিবাহ নিবারণের ক্ষমতা নিশ্চয় খর্ব হচ্ছে। বিনয় ঘোষের প্রশ্নটির ধরনে একটা অসহিষ্ণু রুক্ষতার ভাব আমাকে পীড়া দেয়। বাল্যবিবাহ নিবারণ রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতির বহু জটিলতায় জড়িত। তার দায় একা

বিদ্যাসাগরের নয়। তবে যে যোগাযোগে বিনয় ঘোষের প্রশ্নটির তাড়না তাকে উদ্ভট howler বলার কোনো কারণ নেই। আবার বাল্যবিবাহ নিবারণের উদ্যোগবৃদ্ধিকে প্রগতি বলতে আপত্তি না থাকলে, বিদ্যাসাগরের ১৮৯১-এর সুপারিশকে রক্ষণশীল বলায় স্বপন বসুর কোনো ভুল নেই। তবে রামকৃষ্ণবাবুর কাছে কোন্‌টা প্রগতি, আর কোথায় রক্ষণশীলতা সেটা তো তাঁর অভিরুচি। তা নিয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

রক্ষণশীলতার প্রশ্নে সেই সভার কথা মনে পড়ে। যেখানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তৃতা থেকে কিছু অংশ আগেই উদ্ধৃত করেছি। ১৮৮৭-র ৬ অগাস্ট শোভাবাজারে মহারাজা কমলকৃষ্ণের হলঘরে সেই সভা। সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাল্য-বিবাহ নিবারণে বড়লাটের কাছে মালবারির প্রস্তাব এবং আবেদনে নানা বিতর্কের শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনের কাছে নিজ নিজ অঞ্চলের মতামত বুঝে নিতে নির্দেশ দেন বড়লাট। তেমন পটভূমিতে এই সভা। অনেক হিন্দু ভদ্রলোক আর বিদ্বজ্জন হিন্দুবিবাহের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রচলিত হিন্দু ধর্মীয় আচারব্যবস্থার ন্যায়সংগতি, উৎকর্ষ ও শাস্ত্রানুগত্য নিয়ে তাঁরা প্রচুর যুক্তিবিন্যাস করেন। খ্রিস্টান বাবু জয়গোবিন্দ সোমের বক্তৃতায় একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ছিল। লালবিহারী দে-র এক উক্তির স্মরণে তিনি নিজেকে 'হিন্দু-খৃষ্টান' বলে পরিচয় দেন। যাই হোক তাঁর ভাষণের কথা এখানে বলছি না।

রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কি না জানি না। অনেকের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসুও বক্তৃতা করেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের কথা আমরা জানি। তারপরে এক মাসের মাথায় (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭) বউবাজারে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন হলে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু বিবাহ' প্রসঙ্গে অসামান্য প্রবন্ধটিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি যেন ওই সভায় উচ্চারিত বাল্যবিবাহের পক্ষে সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করলেন। বলপূর্বক বাল্যবিবাহ ওঠানো যায় সেরকম কোনো আস্থা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

শোভাবাজারের সভায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র হিন্দুর ধর্মীয় বিশ্বাসে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সমর্থন করেননি। তবে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণে তাঁর একটি মন্তব্য,

> I have another remark to make about the speeches. They produced in me a sense of intense conservatism—an excessive amount of Toryism, unrelieved by any dissent.

Every thing we have is good, and nothing should be done to disturb the *status quo*.

একই বক্তৃতায় প্রজাপতির নির্বন্ধে কন্যা সম্প্রদান সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল বলেন, এক্ষেত্রে কন্যার পক্ষে নির্বাচন, পছন্দ বা সম্মতির অবকাশ নেই, যেন একটি বই, ছবি, গরু বা আর কোনো অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়া হচ্ছে। (Hindu Marriage 1887 : 85-86, 88)

দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের একতিয়ার আলাদা, তা নিয়ে কিছু কথা লিখেছেন রামকৃষ্ণবাবু। সহবাস-সম্মতি আইন বলাৎকারের অপরাধে জড়িত। বিবাহের আইন দেওয়ানি একতিয়ারে পড়ে। তাই বিদ্যাসাগরের সুপারিশ কোনোমতেই বাল্যবিবাহের প্রশ্নে যুক্ত নয়। যোগাযোগ কী আগেই লিখেছি। এবারে দেওয়ানি ফৌজদারির ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করি। রামকৃষ্ণবাবুর মত: 'আইনের দিকটা এঁরা একেবারেই জানেন না।' এঁদের মধ্যে আমিও আছি। তাই ভয়ে ভয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেখি।

ইংরেজ শাসিত ভারতে হিন্দু আইন, মুসলমান আইন এবং ইংরেজদের 'কমন ল'-এর সংমিশ্রণ ঘটছে। (Markby 1977 : 2) তৈরি হচ্ছে ইঙ্গ-ভারতীয় আইন। 'কমন' তথা সার্বজনিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান আইন আলাদা বোঝাতে 'personal' কথাটির প্রয়োগ। এখানে 'personal'-এর অর্থ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য বিশেষ আইন। ওই 'কমন-ল'-এরও অনেক মিশেল—গ্রহণেবর্জনে নিজস্ব ধর্মীয় পরম্পরা, প্রচলিত প্রথা ও দেশাচারের সঙ্গে মিলিত হয়েই তা নাগরিক সমাজের (civil society) উপযুক্ত আইনব্যবস্থা। সমগ্র রাজ্যে সব রাজকীয় আদালতেই সেই আইন প্রযোজ্য। অঞ্চল থেকে অঞ্চলে আর অন্য কোনো স্থানীয় আইনের একতিয়ার থাকছে না। এভাবে নানা স্তরে খণ্ড খণ্ড আলাদা আলাদা প্রথা ও বন্দোবস্তের বিলোপ অনিবার্য। ইংরেজের আইন আবার কোনো সংহিতায় গোছানো নেই। বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য নিয়মের নির্দেশ আছে। একই ধরনের মামলার আগে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে বিচারকের বিবেচনায় সেটাও যথেষ্ট প্রাধান্য পায়।

এমন রীতিনীতির সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র এবং শরীয়তের বিধানকে জড়িয়ে আইন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান ইংরেজ শাসকবর্গ। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে তার আরম্ভ। উইলিয়ম জোনস-জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের যুক্ত প্রচেষ্টা থেকে কোলভিল-বিদ্যা-সাগরের সহযোগিতা এবং আরও অনেক উদ্যোগে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে

ঔপনিবেশিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মেলবন্ধনে বিরাম নেই।

এ দেশ ও সমাজের ঐতিহ্যে কিন্তু ধর্মশাস্ত্র ও শরীয়তের প্রাধান্য জড়িয়ে থাকত নানা স্তরে জাতি গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নিজ নিজ গণ্ডিতে তাদের প্রথামতো জীবনের অনেক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ। তাই ধর্মশাস্ত্রের বিধানকে এক বা একাধিক নিরুদ্ধ ব্যাখ্যায় ইংরেজ আইন ও বিচার-পদ্ধতিতে সংলগ্ন করলে সমানেই গরমিল চলতে থাকে। সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ এমন সব 'দেওয়ানি' ব্যাপারেই বেশি সমস্যা। ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে 'পিনাল কোড'-এর সংহিতা নির্মাণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ খুন, চুরি, অন্যের বিষয়ে অগ্নিসংযোগ, জালিয়াতির মতো অপরাধ যেখানেই ঘটুক তা অনেকটা একই রকম। (Indian Law Commission 1879 : 9) তবু ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রণয়নেও মেকলে দেশ এবং সংস্কৃতির পার্থক্যজনিত সমস্যার কথা আলোচনা করেন। সেখানে ইংরেজি দণ্ডনীতির ছকটাই অনুসৃত। কোন্ অপরাধে কী দণ্ড হতে পারে তাও নির্দিষ্ট।

মোগল বা তার পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনের বয়ান থেকেই দেওয়ানি (দিওয়ানি) কথাটি এসেছে। তা বোঝাত প্রধান শাসনবিভাগ। সম্পত্তি, রাজস্ব, ধর্ম, কৃষি, ক্রীতদাস প্রভৃতি নানা বিভাগ ছিল। ইংরেজ শাসনে ব্যক্তির অধিকার-সংক্রান্ত আইন দেওয়ানি একতিয়ারে পড়ে, আর অপরাধসংক্রান্ত আইন ফৌজদারির অন্তর্গত। দেওয়ানি আইনে সম্পত্তি, পরিবার, বিবাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, গোষ্ঠীর গঠন ও জীবন, বর্ণগত মৈত্রীর (caste fellow) মতো ব্যাপারে অনেক বৈচিত্র্য। সেখানে প্রতিপদে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন মানুষের, নানা গোষ্ঠীর স্মৃতি, মমতা, অভিরুচি, আস্থা, সংস্কার ইত্যাদির অজস্র প্রকারভেদ যার যথা-যোগ্য বোঝাপড়া ব্যতীত দেওয়ানি আইনের সম্যক বিন্যাস সম্ভব নয়। (*ibid*)

পূর্বোক্ত কমিশনের রিপোর্টেই আবার সেই ভাবনা ছিল যে ইউরোপীয় শাসক কীভাবে তার নিজের সীমা ছাড়িয়ে শাসিতের 'অপর' সত্তাকে চিনতে পারে। এই 'অপর'কে বোঝার দায় তো প্রতীচ্যের আত্মশ্লাঘা, যেন তাদের চেনাজানার দৌলতেই পদানত উপনিবেশের সভ্য অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সেখানে নিজেদের শাসনক্ষমতা এবং যোগ্যতার ন্যায়সংগতি নিয়ে পরম প্রত্যয়ের লক্ষণ। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

ধর্মশাস্ত্র, শরীয়ত এবং 'কমন-ল'-এর যোগাযোগে যে ধরনের বিধিব্যবস্থার উদ্ভব এবং বিকাশ, সমাজচিন্তায় সংশ্লিষ্ট আইনের মানববিজ্ঞানে (ethnography) তার আখ্যা **legal pluralism** অর্থাৎ একটি সমাজ ও রাষ্ট্রে একাধিক আইন-

ব্যবস্থার সমাবেশ আর নিয়ত টানা-পড়েন। (Hooker 1975 : Chapter II) শাসকের আইন ইংরেজের 'কমন ল' বা মহাদেশীয় ইউরোপের অন্যান্য দেশের সংহিতায় লিপিবদ্ধ 'সিভিল কোড' যাই হোক, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকায়, বৃটিশ, ফরাসি, ওলন্দাজ, জার্মান, পোর্তুগিজ উপনিবেশসমূহে সেরকম মিশ্রিত আইনব্যবস্থার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আঠারো, উনিশ, বিশ শতকের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা তেমন আইনের কাঠামোয় বিজড়িত। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরও তার জের চলতে থাকে। আজকের ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু মুসলমানের 'দেওয়ানি' আইনের কথায় তারই দৃষ্টান্ত। আর হিন্দু কোড-এর মধ্যেও সেই মিশ্রিত পরম্পরার সঙ্গে বোঝাপড়ায় দৃষ্টান্ত আছে। এতকাল পরে না থাকলেই অবাক লাগত, কারণ, The *dharmashastras* itself differs from the English law with which it has to consort as chalk from cheese. (Derrett 1957 : 11) ১৯৪১-এর 'হিন্দু ল কমিটি'র আলোচনাতেও অনেক অভিজ্ঞতার পর একটি যুক্তিসম্মত, সুসংগত হিন্দু আইনের সংহিতা (code) নির্মাণের সমস্যাই গুরুত্ব পায়। (Hindu Law Committee 1941 : 11-12)

দু-শতাব্দী জুড়ে পর্বে পর্বে সেই মিশ্র আইনব্যবস্থার ভাঙাগড়ার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার সাধ্য বা অবকাশ এখানে নেই। তবু সমস্যাটির উল্লেখ এই কারণে যে ইংরেজের ভারতবর্ষে আইনের উল্টোপাল্টা বিড়ম্বনা বারবার হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সমকালে তাঁরই উদ্যোগে প্রবর্তিত বিধবার বিবাহ বিধানেও কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে সে আইন অনেক সময়ে তার নিজস্ব উদ্দেশ্যকেই খর্ব করেছে। প্রভু-দাস, মালিক-কিষান-মজুর, সম্পত্তির হস্তান্তর, প্রজাস্বত্ব প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে বহু নিয়ম-অনিয়মের অসংগতি এবং আরোপিত শৃঙ্খলার প্রতারণা। ১৮৮৫-তে রুক্মাবাঈয়ের মামলায় তো এটাও প্রকট, 'the conservatism of British law courts which perpetuated Hindu orthodoxy on the one hand and brought in English reactionary practices on the other.' (Natarajan 1959 : 84)। সব মিলিয়ে এই আইনব্যবস্থায় ছলনার ধরনধারণ যেন পুরাণ মাফিক রহস্যময়তায় আবৃত। (Chandra 1977, 1992)। চারপাশের জগতে এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিদ্যাসাগর বড় একটা সরব হননি। পরিপার্শ্বে কোনো সমস্যা যত নিদারুণই হোক, তার সম্পর্কে নীরবতাই সম্ভবত কাজের লোকের লক্ষণ।

কোনো বিরূপ কটাক্ষ করছি না। ঘরেবাইরে নানা বিরোধে বিসংবাদে

১৮৬০-এর পরবর্তী জীবনে বিদ্যাসাগর অনবরত ক্ষতবিক্ষত। প্রথম দিনের যে সংকল্প আর সংগ্রামে তিনি শুরু করেছিলেন, এক প্রতিকূল সমাজের তুমুল বিরুদ্ধতায়, তার উল্টোপাল্টা গতিপ্রকৃতির মোচড়ে মোচড়ে বিদ্যাসাগরের অনেক মহৎ অভিপ্রায়ই যেন কক্ষচ্যুত হয়ে যায়। বিধবাবিবাহ আইনের কোনো কোনো জটিলতা নিয়ে তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার দু-একটি দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু হিন্দু-ইংরেজ আইনের সর্বত্রগামী আধিপত্য কীভাবে অনেক হিন্দু জাতিগোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথাকে (custom) অস্বীকার করতে পারে, তার সঙ্গে বোঝাপড়ার উপলব্ধি বা অবকাশ বিদ্যাসাগরের ছিল না। অসামান্য উদ্যোগবিশিষ্ট মেট্রোপলিটন কলেজের সাফল্যেও অন্তরায়ের অবধি ছিল না। তখন তো বিদ্যাসাগরের জীবন অনেকটাই শুধু নিরুপায়ের যন্ত্রণা!

উপনিবেশে মিশ্র আইনব্যবস্থায় অনেক জটিলতা। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে তার প্রভাব দেশজ অনেক পরম্পরা এবং প্রতিষ্ঠানকে তাদের উপযোগী ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেয়। (Derrett 1977 : XI) তবে কোনো ব্যবস্থাতেই 'ফৌজদারি' এবং 'দেওয়ানি' সামাজিক অর্থে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। প্রাচীন হিন্দু সমাজে নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের নির্মাণের তেমন বিচ্ছেদ নেই। সম্পত্তির ব্যবস্থা বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তির অপরাধ শনাক্ত করা যায় না। অপরাধীকে চিনে নিয়ে শাস্তি দেওয়ার কাজ ফৌজদারি একতিয়ারে পড়ে। কিন্তু চুরির অপরাধ কী, তার সঙ্গে জড়িত অধিকার-অনধিকারের ব্যাপারে 'দেওয়ানি' সূত্রের যোগাযোগ অপরিহার্য। যেমন ফৌজদারি আদালতে সেই গরুচুরি বিচার। সাক্ষী কমলাকান্ত বলে বসল, যে দুধ খায় তারই তো গরু। সেখানেই ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law আর ইউরোপের International Law-এর প্রভেদ। আরও তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাও ওঠে, 'Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft'.

কোনো প্রকারেই এই 'right' তথা অধিকারের কথা বাদ দিয়ে আইনব্যবস্থার নির্মাণ সম্ভব নয়। দর্শন, সমাজবিজ্ঞান থেকে এক গাদা জমকালো নাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই। 'দেওয়ানি' 'ফৌজদারি' যে নামেই তাকে ডাকি, সমাজে, রাষ্ট্রে, মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সম্পর্কে তেমন অধিকারের সীমাপরিসীমাতেই আইনের মর্মকথা। কৌমসমাজ, নগররাষ্ট্র, সামন্তযুগ, বণিকতন্ত্র, ধনতন্ত্র প্রভৃতি নানা পর্বের শাসন শোষণ সংস্কৃতি অনুযায়ী তার প্রকরণ এবং স্বীকার-অস্বীকারের আয়তন অবশ্যই আলাদা। ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক

কানে তাঁর বিরাট গ্রন্থের সূচনাতেই 'ধর্ম' কী তা বোঝাতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেখানে মূল বক্তব্য হলো আর্য হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের বিভিন্ন বর্ণ অনুসারে প্রতিটি আশ্রমে কী কী কর্তব্য আর অধিকার। রাজার দণ্ডনীতিও ধর্মানুগত হওয়া বিধেয়।

আইনের নিষ্পত্তিতে দু-রকম বিচারের প্রয়োজন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অধিকার নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ। তার কারণ হতে পারে বিষয়সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, গোষ্ঠীর গঠন ও গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি ব্যাপার। বিচারকের কাজ আইন অনুসারে কোনো দাবির ন্যায়সংগতি নির্ধারণ আর মামলার নিষ্পত্তি। এটাই দেওয়ানি একতিয়ার। আবার স্বীকৃত সব অধিকারের ক্ষেত্রে যদি কেউ ছলে-বলে-কৌশলে অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করে, সেটা ফৌজদারি একতিয়ার। দৃষ্টান্ত খুন, চুরি-জোচ্চুরি, দৈহিক আঘাত, ডাকাতি, রাহাজানি, অসামাজিক যথেচ্ছাচার, আইন অমান্য, রাষ্ট্রদ্রোহ প্রভৃতি। তখন আসে অভিযুক্ত আসামীর কথা, অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগ এবং দোষের প্রমাণ, রাষ্ট্রের ভূমিকা, সঙ্গে পুলিশ, কোতোয়াল, ফৌজদার, বিচারক ইত্যাদি— প্রমাণিত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডবিধান। দুটি শাখাকে একত্র করেই পুরো আইনব্যবস্থা। জজিয়তি ওকালতিতে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ মানুষদের কাছে ওই বিভাজনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো আইন ফৌজদারি দণ্ডবিধির অন্তর্গত বলে তার কোনো 'দেওয়ানি' সামাজিক তাৎপর্য নেই।

সহবাস-সম্মতি আইন ফৌজদারি বিষয়ক। বিবাহের নিম্নতম বয়স ইত্যাদি পারিবারিক প্রসঙ্গ দেওয়ানি আইনের আওতায় পড়ে। তাই বিদ্যাসাগরের সুপারিশ বাল্যবিবাহের অনুকূলে যাচ্ছে না, এমন কথার প্রকৃত ভ্রান্তি আগেই বলেছি। আইনের সারকথা বোঝাতে বলব বাল-স্ত্রীর সম্পর্কে তার স্বামীর অধিকারের প্রশ্নে 'দেওয়ানি' চিন্তা কী, বালস্ত্রীরই বা কী অধিকার, সে ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মতামত জানবার জন্যই বিলটি বিদ্যাসাগরের কাছে প্রেরিত হয়। অন্যথায় নিছক বলাৎকারের ফৌজদারি বিল বিদ্যাসাগরকে পাঠাবার প্রশ্ন অবান্তর। আর 'দেওয়ানি' জিজ্ঞাসা এখানে হিন্দু আইন তথা ধর্মশাস্ত্রের বোঝাপড়ায় জড়িত। সে বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের সুপারিশ কোন্ যুক্তিতে বাল্যবিবাহের অনুকূলে যাচ্ছে তার আলোচনা আগেই করেছি। দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রশ্নে যেভাবে রামকৃষ্ণ-বাবু দেওয়ানি-ফৌজদারি বিভাজনকে প্রয়োগ করতে চান তাকে বলা হয়

'black letter law' অর্থাৎ যে ব্যাখ্যায় আইনের কথায় কথায় সামাজিক তাৎপর্যের প্রশ্নটাই হারিয়ে যায়। (Galanter 1994 : Introduction by Rajeev Dhavan, XVII)

নিম্নতম বয়স বারো বছরে নির্ধারিত করেই ১৮৯১-এর সহবাস-সম্মতি আইন প্রণীত হয়। পরে ন্যূনতম বয়স বাড়াবার জন্য সে আইনও সংশোধিত হয়েছিল। তার মধ্যে রামকৃষ্ণবাবু বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তো বয়স বাড়াতে বলেননি। ঋতুদর্শনের আগে মেয়েদের সহবাস-সম্মতি নিষিদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। যাই হোক, যে যোশী কমিটি (১৯২৮-২৯) বিবাহের ন্যূনতম বয়সের কথা সুপারিশ করেছিল তার কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (আমার অনুবাদ, Joshi Committee 1928-29) :

> রজোদর্শন মেয়েদের শারীরিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির লক্ষণ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কেবলমাত্র বয়ঃসন্ধি এবং ভ্রূণ উদ্‌গমের সূচনা। …কে বলবে যে একটি চোদ্দ বছরের ছেলে সারাদিন কঠোর শ্রমে সক্ষম, কারণ তার গলা ভেঙেছে। অথচ ছেলেদের ক্ষেত্রে গলা ভাঙাই বয়ঃসন্ধির একটি লক্ষণ।
>
> (p. 160)
>
> এই কমিটির বিচার্য বিষয়ের মধ্যে সরাসরি বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ বা দণ্ডনীয় করার কথা নেই। কিন্তু অন্য বিষয়ের সঙ্গে কমিটি এ বিষয়টিও আলোচনা করেছে যে বিবাহিত জীবনে বর্তমান সহবাস-সম্মতির আইন কতটা কার্যকর হতে পারে, আর একে আরো ফলপ্রদ করার উদ্দেশ্যে অন্য কী প্রতিকারের প্রস্তাব সম্ভব। (p. 8)
>
> সহবাস-সম্মতি আইন তো নেহাৎ পাশ থেকে (from the flank) সমস্যার মোকাবিলা। বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করে তার সরাসরি মোকাবিলার বিবেচনা না করলেই নয়। (p. 8)

হরবিলাস সার্দার প্রস্তাবিত বিলটির আলোচনা রিপোর্ট বেরনো পর্যন্ত মুলতুবি ছিল। কমিটির প্রস্তাব ছিল, (১) মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স হবে চোদ্দ, পুরুষের আঠারো, (২) বিবাহিত মেয়ের সহবাস-সম্মতির ন্যূনতম বয়স পনেরো বছর ধার্য হবে, (৩) অবিবাহিত মেয়ের সহবাস-সম্মতির ন্যূনতম বয়স হবে আঠারো বছর।

সারদা আইনে (১৯২৯) মেয়ে ও পুরুষের বিবাহের নিম্নতম বয়স যথাক্রমে চোদ্দ এবং আঠারো বছর ধার্য হলো। ১৯২৫-এর ২৯ আইনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে

সহবাস-সম্মতির নিম্নতম বয়স মেয়েদের জন্য তেরো বছর ধার্য হয়েছিল। বাল্য-বিবাহ নিয়ন্ত্রণ তথা সারদা আইনের (১৯২৯) সঙ্গে যথাযথ কোনো পরিবর্তন মেয়েদের সহবাস-সম্মতির (দাম্পত্য জীবনে) নিম্নতম বয়সে করা হয়নি। ১৯৩৫-এ এলাহাবাদে দায়রা আদালতের একটি মামলায় অবশ্য এমন বিচার হয়েছিল —বিয়ে যে বয়সেই হয়ে থাক স্ত্রীর চোদ্দ বছর বয়সের নীচে তার ওপর স্বামীর অধিকার আইন বিরুদ্ধ। (Sastri 1956 : 15)। অবিবাহিত মেয়েদের সহবাস-সম্মতির নিম্নতম বয়স চোদ্দ বছর থাকল।

দেওয়ানি-ফৌজদারি একতিয়ারে জোড়াতালি দিয়ে হলো শাস্তির ব্যবস্থা। সেই মিশ্র আইনব্যবস্থার দায় তো থাকতে বাধ্য। বিবাহের বয়সসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিত হলেও বিয়েটি বাতিল নয়। সেরকম বিধান হিন্দু বিবাহের ধারণায় নেই। সংশ্লিষ্ট অন্য জটিলতাও ছিল। ফৌজদারি দণ্ডবিধির কার্যপ্রণালীতে এটা প্রথম যে প্রচলিত কোনো আইনের বিরুদ্ধে কাজ বা ত্রুটিবিচ্যুতি (act or omission) দণ্ডনীয় অপরাধ। 'বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন' অমান্য করাও অপরাধ এবং তার বিচার হবে ফৌজদারি কার্যনির্বাহের সেই ধারায় যাতে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড, দ্বীপান্তর বা ছ-মাসের বেশি কারাদণ্ড হবে না। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৬১ ধারায় নাবালক-নাবালিকা অপহরণসংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে অভিভাবকদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বন্দোবস্তও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেতা-মাফিক শাস্তি দাঁড়ায় ১০০০ টাকা অবধি জরিমানা বা এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। জরিমানা ও কারাদণ্ড দুইই একসঙ্গেও প্রযোজ্য।

বিয়ের নিম্নতম বয়স বেঁধে সারদা আইনের শঙ্কাতেই দেশজুড়ে যে বাল্য-বিবাহের ধুম পড়েছিল, তার পরিচয় ১৯৩১-এর সেন্সাস রিপোর্টের তথ্য এবং বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। তখন আবার সেই ভাবনাও অলীক থাকে না যে চার দশক আগে বিদ্যাসাগরের মতো দেশবরেণ্য মানুষের সেই মন্তব্য ('গর্ভাধান একটি অনুষ্ঠান যা অবশ্যকৃত্য ও বাংলায় সাধারণভাবে পালিত হয়') সমাজে কী প্রভাব ফেলতে পারে।

নারীকল্যাণ ছিল বিদ্যাসাগরের মহৎ আদর্শ। তবে ১৮৬০ বা ১৮৯১-তে অবিবাহিত মেয়েদের সহবাস-সম্মতির বয়স নিয়ে কোনো আলাদা প্রস্তাব তিনি দেননি। বিধবাবিবাহ এবং কুলীন বহুবিবাহের সমস্যা আলোচনায় ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার সামাজিক কলঙ্কের কথায় বারবার জোর দেন বিদ্যাসাগর। মেয়েদের মঞ্চাভিনয়ে যোগদানে বিদ্যাসাগরের প্রবল আপত্তি ছিল। আবার তত্ত্ববোধিনীর

ভাষায়, কলকাতা মহানগর তো লাম্পট্যবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা।

এমন প্রসঙ্গেই মনে পড়ে স্টেট্‌সম্যান্ পত্রিকার (১৯ মার্চ, ১৮৯১) সেই রিপোর্ট। আগের দিন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে (Vatsa 1971 : 296) ১৫০ জন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম মহিলার স্বাক্ষরিত একটি স্মারক-লিপিতে বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনকে আইনটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাঁদের অনুরোধ ছিল যে বিবাহিতা বালিকার সহবাস-সম্মতির ন্যূনতম বয়স আরও বাড়িয়ে চোদ্দ বছর করা উচিত। অবিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে সহবাস-সম্মতির নিম্নতম বয়স ষোল বছর করার প্রস্তাব ওই মহিলারা করেন। বৈবাহিক বলাৎকারে বালস্ত্রীর মৃত্যু না হলে অপরাধী স্বামীর শাস্তি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বেশি না করার প্রস্তাব ওই স্মারকলিপিতে ছিল।

রাজনীতি

বিদ্যাসাগর সহবাস-সম্মতি আইন চেয়েছিলেন। তাঁর সেদিনের প্রস্তাবে কিন্তু শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুত্বের সঙ্গে বিরোধ নেই। আইন চাওয়া না-চাওয়ার ব্যাপারে তফাত আছে। সেটা রাজনীতির ব্যাপার। বিদ্যাসাগর চিরদিনই নৃপতির উপদেষ্টা ভূমিকাকে মানবকল্যাণ, নারীমঙ্গল, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি হিতকাজের উপায় মনে করতেন। তার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয়েছে তাঁর অমিত উদ্যম, অবারিত অর্থব্যয়, অকুতোভয় সংগ্রাম। বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন বোঝাতে তিনি লিখেছিলেন, 'যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় মুসলমান বা অন্যান্য প্রদেশীয় হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন, অথবা তাহারা অসন্তুষ্ট হইবেক এই ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রার্থিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন, একথা কোনও মতে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। ইংরেজ জাতি তত নির্বোধ, তত অপদার্থ ও তত কাপুরুষ নহেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া এদেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই ; সর্বাংশে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

আবার 'কুলীন মহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা, কিন্তু আমরা সেকথায় বিশ্বাস করি না ; স্ত্রীলোকের রাজ্যে স্ত্রী-জাতির এত দুরবস্থা হইবে কেন। ...উল্লিখিত আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী

করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হন, সন্দেহ নাই।'

১৮৯১-এর সুপারিশও বিদ্যাসাগরের সেই রাজনীতিতে গ্রথিত। তিনি লিখতে পারেন, 'এই বিধি লঙ্ঘনের যে-শাস্তি শাস্ত্রে বিহিত আছে তা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির, এবং তা না-মানা হতে পারে। ধর্মীয় নিষেধকে আরও ফলপ্রসূ করা হবে যদি একটি দণ্ডমূলক আইনে এটি বিধিবদ্ধ করা হয়।' (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের অনুবাদ)। এখানে তো 'দেওয়ানির' আড়াল ও ফৌজদারির দণ্ডবিধানে সংযোগ ঘটছে। সমকালীন রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিও তাতে প্রচ্ছন্ন। চণ্ডীচরণের উদ্ধৃতি দিয়ে আধুনিক রাজকর্মচারীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অপরিচয়ের যে সমস্যা রামকৃষ্ণবাবু তুলেছেন তা ওই রাজনৈতিক ভূমিকার সমস্যায় সংশ্লিষ্ট।

অন্যদিকে শতাব্দীর শেষ তিন-চার দশকে শাসন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে মধ্য-বিত্তের হতাশা ও আপত্তি বাড়তে থাকে। তারই এক ধরনের প্রকাশ সেই প্রতিরোধে যে আমাদের ঘর-গৃহস্থালির ক্ষেত্রে বিদেশী রাজশক্তির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা যায় না। অমৃতলাল বসুর 'সম্মতি সঙ্কট' নাটকে বাড়ির কর্তা মাণিক খেদ করেন, 'এসব হল কি! টেক্স নিচ্ছিস নে বাবা, আমাদের ঘরের ভেতর কি হচ্ছে—মেয়ের বে, ছেলের বে, এসবে বাবু কোম্পানীর হাত কেন?' তাঁর স্ত্রী রামমণি আরও সোজা কথার লোক, 'পুনর্বে হলে জামাই ধরে শোবে না ত কি তিন ছেলের মা হলে শোবে? আবার আইন করেছেন বারো বছর? তিলক জানে না, ঐ যে আমার তেরো বছরে হয়েছিল।' এ হিন্দুত্ব নিশ্চয় একটু বেশি স্থূল। শশধর তর্কচূড়ামণির মতো। তবে পুনর্বেতে জামাই ধরার যে সংস্কার তার বিরুদ্ধে যেতে বিদ্যাসাগরের সুপারিশও অপারগ।

ব্যাপক অর্থে বিদেশী রাষ্ট্রীয় প্রতাপের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের সূচনা সেই সময়েই হচ্ছে। তেমন মনোভাবে জড়িত 'সাহেব ডব্লু. সি. ব্যানার্জি', তিলক, কিছুটা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং আরও অনেকের 'কনসেণ্ট বিল' বিরোধিতা। কংগ্রেসের অধিবেশনে সমাজসংস্কারের প্রশ্ন কেন গৌণ তা নিয়ে বহু কথা হচ্ছিল। সমাজসংস্কার অথবা রাজনৈতিক সংস্কার কোন্‌টা আগে তা নিয়েও দেশ জুড়ে বিদ্বজ্জনের তর্কাতর্কির অবধি ছিল না। কথা উঠতে পারে, কংগ্রেসের প্রথম যুগের আবেদন-নিবেদনেরও ইংরেজ শাসনকর্তাদের সুবুদ্ধি সম্পর্কে ভরসার পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিবারণের আবেদনেও তো তারই পরিচয়। তবে বিদ্যাসাগরের রাজনীতি কোথায় আলাদা? কংগ্রেসের উদ্যোগ ছিল বিদেশী

শাসকের সুবুদ্ধি জাগ্রত করে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার অর্জন, তাঁদের ধারণা সেই পথে দেশের প্রকৃত মঙ্গল। বিদ্যাসাগরের প্রত্যাশা 'করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর' মমতাতেই কুলীন মহিলার দুর্দশা দূর হতে পারে। সেখানেই তফাত।

নতুন রাজনীতিতে বিদ্যাসাগর অনাত্মীয়। তিনি অন্য পর্বের মানুষ। পরিপার্শ্ব নিয়ে ক্ষোভ হতাশা তাঁর কম ছিল না। নিজের অনেক অভিপ্রায়ই তাঁর জীবনে সফল হয়নি। এখানে একটি গল্পের কথা মনে আসে। হতে পারে যে নিজের রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়েই কংগ্রেসের তখনকার ধরনধারণে বিদ্যাসাগরের সেই প্রতিক্রিয়া 'দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারবে ?' (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ২০) নিজের পটভূমি, সমাজের প্রতিকূলতা, তার অনেক দুরত্যয় সীমানার মধ্যেই তো বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট চরিত্র ও সংগ্রামের ঐশ্বর্য আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু। অসুস্থ শরীরে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর সেই সুপারিশ যে জীবনের প্রথম সামাজিক নিবন্ধের বিপরীতে চলে যায় এর জন্য আমি রামকৃষ্ণবাবু-কথিত কোনো 'আসামীর কাঠগড়ার' কথা ভাবতে পারি না। শাস্ত্রে যাই থাক, নিজের একটি কন্যাকেও বারো বছর বয়সের কমে পাত্রস্থ করেননি বিদ্যাসাগর। ১৯৭৭-এর বইতেও 'আসামীর কাঠগড়া' ছিল আমার চিন্তার অতীত। ট্র্যাজিক এক অভিজ্ঞতার কথাই বলতে চেয়েছিলাম। ক্রিস্টোফার হিলের সেই কথাটা ভুলবার নয়—ইতিহাস ট্র্যাজিডির উত্তরণপরম্পরা, যদিচ তা নিরর্থক নয়। মাঝেমধ্যে প্রহসনও ঘটে যায়। আমাদের হয়তো সেটা একটু বেশি।

বর্তমান আলোচনার প্রধান বক্তব্য কয়েকটি,

১. ১৮৫০-এর 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের মতামত তাঁর ১৮৯১-র সুপারিশে খর্ব হচ্ছে। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিতে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্যানধারণা স্মৃতিশাস্ত্রের পরম্পরায় সীমাবদ্ধ নয়।

২. শাস্ত্রীয় পরম্পরা এবং যুক্তিবুদ্ধি মিলিয়ে যে 'অগ্রাঘাতের' পরিচয় বিধবাবিবাহ বিধান এবং বহুবিবাহ নিরোধের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলোচনায় অবশ্যস্বীকার্য, ১৮৯১-এর সুপারিশে তার উল্টো ফল দ্রষ্টব্য। কন্যার 'স্ত্রীধর্মিণী' হওয়ার সঙ্গে 'গর্ভাধান' সংস্কারের যে সম্বন্ধ তাতে বাল্য-বিবাহ 'কলিগ্রাহ্য' হয়ে পড়ে। তেমন সংস্কারে সরকারি হস্তক্ষেপ সমর্থন করতে বিদ্যাসাগর অপারগ।

৩. ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিশেষ ধারাটিতে সহবাস-সম্মতির ক্ষেত্রে

মেয়েদের নিম্নতম বয়স ধার্য করার সঙ্গে 'বৈবাহিক বলাৎকার' (marital rape)-এর প্রশ্ন জড়িত। তাই হিন্দু অথবা অন্য কোনো সম্প্রদায়সাপেক্ষ (personal) আইন এবং ইংরেজ 'কমন ল'তে মিশ্রিত ঔপনিবেশিক আইন-ব্যবস্থায় ওই ফৌজদারি ধারাটির সঙ্গে বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক আছে।

৪. বিদ্যাসাগরের সুপারিশে তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক আস্থার পরিচয় আমরা পাই।

৫. ১৮৯১-এর সুপারিশের দরুন বিদ্যাসাগরকে কোনো 'আসামী'র দায়ে অভিযুক্ত করা আমার চিন্তার অতীত ছিল। যে অভিযোগ নেই তাই নিয়ে 'মামলা' তুলে বিদ্যাসাগরের পক্ষে ওকালতি চমকপ্রদ হলেও সে কিন্তু একজন 'মক্কেলহীন' (briefless) উকিলকেই শোভা পায়।

উল্লেখযোগ্য একটি ব্যাপারে এখন কিছু বললাম না। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভিক্টোরিয়ান সাহেবি রাজ্যে সহবাস-সম্মতি থেকে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রভৃতি নানা ব্যাপারে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ নিয়ে অনেক গুরুতর প্রশ্ন উঠেছিল। আমাদের মিশ্র, পরাধীন আইনব্যবস্থায় তার প্রভাব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভাববার কথা শাসকের নিজস্ব পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে হিন্দু পুরুষতন্ত্রের যোগাযোগ নতুন কী প্রকারপ্রকরণ গড়ে দিচ্ছে। দেশেবিদেশে এ নিয়ে প্রচুর তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলছে। তার কথা এই প্রবন্ধে নেই। গোড়াতেই বলেছি এখানে রামকৃষ্ণবাবুর সওয়াল-জবাবেই আমার আলোচনার সীমা নির্ধারিত।

লেখাটিতে প্রত্যাঘাতের বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য আমার নেই। রামকৃষ্ণবাবু নানা-ভাবে ঘুরেফিরে জানিয়েছেন আমার লেখাপড়া কত নগণ্য। সে ব্যাপারে আমার তো কোনো দাবি নেই। খুব-কিছু লিখতেও পারি না। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলবেন না, পাঠকের তেমন শিষ্টাচারেই আমার ভরসা। তবে বিদ্যাসাগরের সুপারিশ থেকে যে কটি বাক্য আমার বইতে উদ্ধৃত তার প্রত্যেকটি মূল সুপারিশে আছে। তাই সুবলচন্দ্র মিত্রের সূত্রনির্দেশ করলে কোনো ভুল হচ্ছে না। শাস্ত্রসম্মত, অসম্মত যাই হোক, গর্ভাধান সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণে সকলের আকর্ষণ সমান নয়। বিদ্যাসাগরের সুপারিশ কারা কী কাজে লাগিয়েছিল তার প্রচুর প্রমাণ সে আমলের পত্রপত্রিকায় আছে। আর বিদ্যাসাগরের যেসব জীবনীকার সমাজসংস্কারের কাজকে ছোটো করেছেন তাঁদের সমালোচনা আমার বইতে ছিল। (Sen 1977 : 147)

আর একটি কথা। 'এই বিলটিকে নিঃশর্ত সমর্থন জানাতে আমি অপারগ।

এটি আইন (act)-এ পরিণত হলে যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীরা বারো বছর বয়স হওয়ার আগে ঋতুমতী হবে তাদের গর্ভাধান অনুষ্ঠানে এটি বাধা দেবে।' আমাদের উনিশ শতকের সমাজসংস্কারে সর্বাগ্রগণ্য মানুষ বিদ্যাসাগরের এই উক্তির পক্ষে ওকালতি-সংবলিত কোনো আলোচনার উপযুক্ত স্থান কি বাংলা আকাদেমি পত্রিকার 'নারী' সংখ্যা? অন্য কোনো সংখ্যায় তা ছাপা হতে পারত। রামকৃষ্ণ-বাবুর কাছে আমরা তো সর্বদাই চমকপ্রদ রচনার প্রত্যাশী।

বিদ্যাসাগর ও সমকালীন ধর্মচেতনা

উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু সমাজে ধর্মচিন্তার ইতিহাসে গ্রথিত আছে নানান বিন্যাস-পুনর্বিন্যাসের, নির্মাণ বিনির্মাণের উদ্যোগ আন্দোলন। তেমন সব আন্দোলনের অনেকটা নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সীমাতেই আবদ্ধ ছিল। ইংরেজ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং জীবিকার নতুন বিন্যাস মধ্যবিত্তের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল। তার থেকে গৃহস্থ ভদ্রলোকের ধর্মবিশ্বাস এবং আচরণের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রয়োজনের চাপ এসে পড়ে।

মধ্যবিত্তের মধ্যে উঁচু নীচু স্তরবিন্যাস ছিল। কলকাতার সমাজে তেমন তিনটি স্তরের বিন্যাস পাই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) বইটিতে। (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৩ ব.: ৮-৯) জমির খাজনা, তেজারতির সুদ আর বেনিয়ান মুৎসদ্দীর মুনাফায় সমৃদ্ধ অভিজাত ভদ্রলোকরাই সবার ওপরে ছিলেন। ইংরেজ প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতা, বিত্তের পরিমাপ এবং অবসরের প্রাচুর্যেই নির্ধারিত হতো তাঁদের সামাজিক অবস্থান। নববাবু বিলাসের আমোদ প্রমোদ, উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ সেই বিত্তবানের অবসরেই প্রশ্রয় পেত। আবার জ্ঞানচর্চার ধর্মীয় তর্কবিতর্কে, সমাজে দলপতির প্রতিষ্ঠালাভে অভিজাত মধ্যবিত্তদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

অভিজাতদের পরে গৃহস্থ ভদ্রলোকের স্তর। ছোট জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, চিকিৎসক, উকিল এমন সব মাঝারি অবস্থার বৃত্তিজীবী ভদ্রলোক ছিলেন এই স্তরের মানুষ। বিত্তের স্বল্পতায় এবং জীবিকার চাহিদায় নিয়মিত শ্রমের যোগানেই ছিল গৃহস্থ মধ্যবিত্তের মূল লক্ষণ। সবার নিচে গরিব মধ্যবিত্তের স্তর। এই অবস্থার ভদ্রলোকেরা ছোটখাটো চাকরিতে উদয়াস্ত পরিশ্রমে সামান্য জীবিকা অর্জন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা গ্রামে নিজেদের সনাতন জীবিকা হারিয়ে কলকাতায় আসতে বাধ্য হতেন। ঔপনিবেশিক ভাঙাগড়ায় মানুষের জীবন-জীবিকার জগতে এক নিরন্তর পালাবদল সমানেই চলছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস জীবিকার খোঁজে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায়

আসেন। টোল চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা তাঁদের বংশানুক্রমিক জীবিকা। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সুপণ্ডিত ছিলেন। কারও অনুগত থাকা অথবা তোষামোদি করা রামজয়ের স্বভাবে ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের কথায়, 'তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না।' তখন টোল চতুষ্পাঠীতে পড়িয়ে জীবিকা অর্জনের সুযোগ কমে আসছিল। রামজয় আবার নিজের প্রতাপশালী শ্যালকের ফন্দিফিকিরে বশীভূত হলেন না। তাঁর স্বভাব ছিল নির্লোভ নিস্পৃহ, মাঝে মধ্যে সংসার ছেড়ে চলেও যেতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী চরকায় সুতো কেটে ক্ষীরপাইয়ের বাজারে তা বিক্রি করে কোনোমতে পুত্রকন্যা নিয়ে দিন চালাতেন। সংসারের হাল যখন এরকম, তখনই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ঠাকুরদাস কলকাতায় আসেন। অনেক কষ্টে সামান্য ইংরেজি শিখে তিনি একটি সওদাগরী অফিসে মাসিক দু টাকা মাইনের চাকরি নেন। মাইনে দশ টাকা পর্যন্ত হয়, যখন ঠাকুরদাসের হাত ধরে আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এলেন। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা ও অধ্যবসায় যে অসাধারণ তা বোঝেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় পড়ানোর পরামর্শ তিনি ঠাকুরদাসকে দেন।

তারপরে সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন সংগ্রাম তো একটি গরিব মধ্যবিত্ত ছেলের কীর্তি ও সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবার কাহিনী। সেই প্রস্তুতির জের ধরেই আসে শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অজস্র অবদান। সব সংকল্পের রূপায়নে তাঁর দেশকালের আনুকূল্য বিদ্যাসাগর পাননি। জীবনব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর গরিব মধ্যবিত্ত সূচনার গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। সমকালীন ধর্মচেতনার অনুষঙ্গে বিদ্যাসাগরের নৈঃশব্দ এবং তার বিশিষ্টতা সেই সূত্রেই আমরা বুঝতে পারি কি পারি না, তার হদিস পাওয়ার জন্য তো সেই ধর্মচেতনার বিভিন্ন প্রকাশের কিছুটা বোঝাপড়া প্রথমেই প্রয়োজন।

উনিশ শতকের বাংলায় নতুন ধর্মচেতনার প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। জাতিভেদে এবং কুসংস্কারজীর্ণ হিন্দু ধর্মে আর সমাজে সে এক চরম অবক্ষয়ের সময়। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, নবাবী আমলের করুণ পরিণাম, ইংরেজ অধিকার এবং যথেচ্ছ লুটপাটের নিপীড়ন সব মিলিয়ে সমাজের সর্বত্র তখন যে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা তাতে বর্ণব্যবস্থার দৌরাত্ম্য আর সহনীয় থাকে না। নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ লোকজন জাতিবর্ণভেদের বিরুদ্ধে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান ভেদা-

ভেদকেও নস্যাৎ করে নিজেদের মুক্তির উপায় খোঁজে। সাম্প্রতিক নানা গবেষণায় এমন সব গৌণ ধর্মগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিবাদের কথা আমরা আগের তুলনায় বেশি জানতে পারছি। তবে আমাদের ইতিহাসে লোকসমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে আছে। নাগরিক মধ্যবিত্তের সামাজিক সীমাতেই রামমোহনের অবদান তার আধার খুঁজেছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি ও বিকাশে ইংরেজ শাসনের অনুগ্রহ ছিল একটা বড় আশ্রয়। উনিশ শতকের বাংলায় তথাকথিত নবযুগের ধ্যানধারণায় আর সামাজিক বিন্যাসে প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রেরণা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে ইংরেজি লেখাপড়ায় রপ্ত হওয়ার আগেই রামমোহন একটি আগাগোড়া যুক্তিনির্ভর ফার্সী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তুহ্‌ফাত্‌-উল-মুআহ্‌হিদীন—একেশ্বর-বিশ্বাসীদের নিকট নিবেদন, প্রথম প্রকাশ ১৮০৪, ইংরেজি অনুবাদ ১৮৮৪, বাংলা অনুবাদ ১৯৪৯। (মুহম্মদ আবুতালিব স. ১৯৯৫ : ২৫-৩৮) গ্রন্থটির মূল বক্তব্য তিনটি সত্যের নির্ধারণ, এক ঈশ্বরে আস্থা, আত্মার অস্তিত্ব এবং পরকালে বিশ্বাস। এর মধ্যে আবার পরকালে বিশ্বাস প্রসঙ্গে রামমোহন সামাজিক হিতের যুক্তিটাই বড় করেছিলেন। পরলোকে দণ্ডের ভয়ে মানুষ গর্হিত অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। চিরাচরিত ঐতিহ্য, জানা অজানার আপেক্ষিকতা, ধর্মগুরুর নির্দেশ, ধর্মগ্রন্থের কিংবদন্তি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই রামমোহন যুক্তির প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেন। সামাজিক জীবনের পক্ষে অহিতকর কোনো বিধিনিষেধকেই ধর্মের ওজরে গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে ছিলেন রামমোহন। আর যে কোনো ধর্মেই কিছু না কিছু ভ্রান্ত ধারণার সম্ভাবনা রামমোহন স্বীকার করেন।

'তুহ্‌ফাত্‌'-এর বক্তব্যে সর্বপ্রকার অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের বিপরীতে রামমোহন প্রাকৃতিক নিয়ম, কার্য-কারণ-প্রত্যয় এবং ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার যুক্তিসম্মত উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করেন। ইসলাম ঐতিহ্যের যুক্তিনিষ্ঠা থেকে গৃহীত আরোহ-পদ্ধতির (induction) তাৎপর্যও রামমোহনের আলোচনায় বিশিষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিল। নানা মরমী গূঢ়ার্থে সমৃদ্ধ সুফী মনুষ্যত্ববোধের প্রভাবও ছিল নিশ্চয়। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই রামমোহন যুক্তিনিষ্ঠ 'তুহ্‌ফাত্‌' রচনা করলেন। 'তুহ্‌ফাত্‌' রচনার সময়ে কী ছিল রামমোহনের জানাশোনার জগৎ তা আজও খুব স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। তবে মধ্যযুগীয় সাধকদের মনুষ্যত্ববাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় আদৌ অসম্ভব ছিল না।

'তুহ্ফাত্'-এর প্রায় এক দশক পরে, ধরা যায় ১৮১৫ থেকে রামমোহন রায়ের বৃহত্তর কর্মকাণ্ড শুরু হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনি যে কেবল ইংরেজি শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়েছেন তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবন ও বৃত্তির ক্ষেত্রে সাহেবের দেওয়ানি, জমিদারির সম্পত্তি থেকে তেজারতির সমৃদ্ধি পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছেন। ধনে, মানে, বিদ্যায় তিনি অভিজাত মধ্যবিত্ত স্তরের এক বিশিষ্ট চরিত্র। রামমোহনের সহযোগী প্রিন্স দ্বারকানাথ তো সেই স্তরের এক অগ্রগণ্য ব্যক্তি। অন্যপক্ষে আবার একই স্তরের মানুষ রাধাকান্ত দেব সনাতন হিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষক। মধ্যবিত্তের স্তরবিন্যাসের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার যোগাযোগ নিশ্চয় সত্য। তবে সে যোগাযোগের জটিলতা এপক্ষ ওপক্ষের সঙ্গে স্তরবিশেষের ছকেঢালা সমীকরণে খুঁজলে ভুল হবে।

হিন্দু ও খ্রিস্টান, উভয় ধর্মের প্রসঙ্গেই রামমোহন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে, অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃতের আচ্ছন্নতাকে কঠোর সমালোচনা করেন। ১৮১৫-তে প্রকাশিত হয় তাঁর বেদান্তগ্রন্থ, যে বিশ্লেষণকে ব্রাহ্ম ধর্মমতের প্রধান অবলম্বন বলা যায়। (অজিতকুমার ঘোষ স. ১৯৭৩ : ১-৭) রামমোহনের ব্যাখ্যায় শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র এক অদ্বৈত ব্রহ্মের পরিচয় দেয়। অদ্বৈত ব্রহ্ম অবশ্য নির্গুণ। গৃহস্থের ধর্মে আবার ব্রহ্মকে উপাসনার প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য হওয়া সম্ভব নয়। তাই রামমোহনের চিন্তায় ব্রহ্ম নিরাকার হলেও নির্গুণ নন। ১৮১৭-২০-র বছর-গুলিতে রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং একেশ্বরের প্রমাণে বহু সনাতন পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। একই সময়ে বিভিন্ন উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করে রামমোহন ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিস্তার হদিস দেন।

আবার ১৮২৭-এ মৃত্যুঞ্জয় আচার্যের 'বজ্রসূচী' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদে (অজিতকুমার ঘোষ স. ১৯৭৩ : ৩৩৬-৩৭) রামমোহন সেই উক্তিকে গুরুত্ব দিলেন, যে বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণকে চেনা যায় না, এমনকি ধর্মাচরণের ওপরেও তা প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ ব্রহ্মনিষ্ঠা। তার প্রকাশ দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণে। তবে বর্ণভেদের আস্থা-অনাস্থা নিয়ে একটা দোটানা থেকে যে রামমোহন পুরো মুক্ত হতে পেরেছিলেন এমন কথা বলা যায় না। ১৮২৬-এ প্রকাশিত তাঁর 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' রচনায় এমন মন্তব্য ছিল যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করা আবশ্যিক নয়। (অজিতকুমার ঘোষ স. ১৯৭৩ : ৩৩১)

কলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করার পর রামমোহন ১৮১৫-তে আত্মীয় সভার

প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উদার মতাবলম্বী ভদ্রলোকেরা নিয়মিত আলোচনার জন্য মিলিত হতেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন অভিজাত মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। ১৮২৮-এ নিয়মিত ব্রহ্মোপসনার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা। ১৮৩০-এ তা রূপান্তরিত হয় একটি স্থায়ী উপাসনালয়ে যার ধরনধারণে যত না মিল হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে, তার চেয়ে বেশি খ্রিস্টান গির্জার সঙ্গে। অবশ্য রামমোহনের বিচার-বিবেচনায় হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারী একেশ্বরবাদ ব্রাহ্মধর্মের প্রধান অবলম্বন। খ্রিস্টের রচনাশ্রয়ী যে প্রেম তার প্রেরণার প্রতি রামমোহনের গভীর আকর্ষণ ছিল। আবার খ্রিস্টান ত্রিত্ববাদ (trinity) আর যিশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এসবের কঠোর সমালোচনা রামমোহন করেছিলেন। কোরানেও রামমোহনের প্রেরণা ছিল। মানুষের যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রামমোহন কোরান বুঝতে চান। ব্রাহ্মসমাজের ন্যাসপত্রে (trust deed) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত এক সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ গুরুত্ব পায়। মানুষে মানুষে প্রীতি আর ঐক্যের বন্ধন যাতে দৃঢ় হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতা, সেবা যাতে খুঁজে পায় সম্যক বিকাশের পথ, এটাই ছিল ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে রামমোহনের অন্বিষ্ট।

সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র' ইত্যাদির যুক্তিনিষ্ঠ বিচারেই রামমোহন বিকল্প ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের আবর্তে বৃত্তিতে, জীবনযাত্রায় মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর পক্ষে সনাতন ধর্ম আর আচারবিচারের বন্ধন থেকে কিছুটা অব্যাহতির প্রয়োজন দেখা দেয়। পৌত্তলিকতার আড়ম্বর এবং অপচয়, পুরোহিত পোষণ, আহারাদির ক্ষেত্রে অজস্র বিধিনিষেধ, জাতিভেদের আধিক্য—এসবের সঙ্গে নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের গরমিল বেশ পরিষ্কার। ইংরেজ সাম্রাজ্যের আধিপত্যে এবং তাদের শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে রামমোহন দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে বিরাট রূপান্তরের আশা করেছিলেন। তদনুযায়ী সংকল্পের সঙ্গে রামমোহনের শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার এবং ধর্ম আন্দোলনের অঙ্গাঙ্গি যোগাযোগ ছিল। সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজিতে শিক্ষার প্রচলন আর সতীদাহ নিবারণ তেমন উদ্যোগেরই দৃষ্টান্ত। বিকল্প ধর্মচিন্তায় আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধনাও গুরুত্ব পেয়েছিল। সন্ন্যাসী নয়, গৃহস্থ মানুষই সেই সাধনার প্রবক্তা।

ঔপনিবেশিক বিধিব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে নব্য মধ্যবিত্তের বিকাশ হবে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষাও প্রচলিত হবে। কিন্তু সনাতন ধর্ম ও আচারবিচারের কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন নেই; এমন মতের স্বপক্ষে ছিলেন রাধাকান্ত দেবের মতো হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি। ১৮৩৫-এ রাধাকান্তর প্রতিষ্ঠিত

ধর্মসভার সেই উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম প্রাধান্য লাভ করে। রামমোহনের একদিকে ছিল সনাতনপন্থীদের বিরোধিতা। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় প্রভাবিত তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশ হিন্দু ধর্মকে পুরোপুরি বর্জনে প্রবৃত্ত হলো। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে এমন ইচ্ছার হদিস মেলে। ধর্মান্তর নয়। সব ধর্মের বন্ধনমুক্ত স্বাধীনতা ছিল ডিরোজিওর আদর্শ। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়ায় ডিরোজিও কর্মচ্যুত হন। ১৮৩১ সালে যখন তিনি মারা যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর।

'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত ডিরোজিওর অনুগামীদের মধ্যে কেউ কেউ নিরীশ্বরবাদ থেকে খ্রিস্টধর্ম অবলম্বনের দিকে ঝোঁকেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর ধর্মান্তরে অবশ্য পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ্-এর উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। মনে প্রাণে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সমর্থক হলেও রামমোহন হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হিন্দু আত্মপরিচয় বিসর্জন দেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর চরমপন্থীদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি শিক্ষিত নব্য তরুণ সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং সংস্কারবিরুদ্ধতা ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে প্রকৃত কোনো রূপান্তরের পথ খুঁজে পায়নি। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর মতো মুখপত্রে তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোয় বহু সমস্যা নিয়েই আলোচনা করতেন। কিন্তু জীবনে তার সার্থক প্রয়োগ পরাধীন মধ্যবিত্তের গৌণতায় সীমাবদ্ধ ছিল। তাই আবার অবরুদ্ধ ইচ্ছা অনিচ্ছার তাড়নায় নিছক ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলা আর অমিতাচারের করুণ পরিণামেও অনেকে শেষ হয়ে যান।

অবশ্য ইংরেজের আনুগত্য এবং ঔপনিবেশিক গৌণতা রামমোহনকেও বাধা দিয়েছিল। এখানেই তাঁর প্রকল্পের তাৎপর্য এবং সীমা। 'তুহ্‌ফৎ'-এর আরম্ভে রামমোহন কোনো প্রত্যাদিষ্ট ধর্মশাস্ত্রের আশ্রয় খোঁজেননি। পরে তেমন ঝোঁক প্রাধান্য পায়। এমন কি সতীদাহ নিবর্তকের যুক্তিতেও রামমোহন মনুসংহিতাকে প্রমাণ মেনেছিলেন। সহমরণের পরিবর্তে আজীবন ব্রহ্মচর্যকেই তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় অনুমোদন খুঁজতে গিয়ে রামমোহনের এই বিশ্লেষণে একটা প্রতিকূল সিদ্ধান্তই দেখে থাকবেন। তাই সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের ঐ শাস্ত্রীয় যুক্তি তার পরের পর্যায়ে এক নিষ্ঠুর আয়রণিতে পরিণত হলো। রাধাকান্ত দেবের সনাতন পন্থা, 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিদ্রোহী আবেগ, আর রামমোহনের সংস্কার স্পৃহা কোনো ধ্যানধারণাই ইংরেজের ঔপনিবেশিক প্রাচীর পেরতে পারেনি। বৃহত্তর জনজীবনে তাদের

কোনো সেতুবন্ধন ছিল না। সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মজীবনের সব আয়তনেই সেই সীমার চিহ্ন ইতিহাস ব্যেপে ছড়িয়ে আছে।

ধর্মসংস্কার, ধর্মান্তর এবং হিন্দু রক্ষণশীলতার ঘাতপ্রতিঘাতে যখন কলকাতায় নানা আলোড়ন চলছে, তখন বালক ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে কলকাতায় এলেন। তাঁর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবন শুরু হয় ১৮২৯-এ। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স নয়। সেই বছরই সতীদাহ নিবারণ আইন প্রচলিত হলো। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টান হলেন ১৮৩২-এ। তার বছর দুয়েকের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে ব্রিস্টল শহরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু। বড়বাজারে দয়েহাটা অঞ্চলে জগৎদুর্লভ সিংহের বাড়িতে আশ্রিতদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুরদাস এবং তাঁর বালক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। জীবনযাত্রায় দৈনন্দিন কাজের চাপে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকৈশোর যৌবন। সেই পরিস্থিতিতে সংস্কৃত কলেজের অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটির চিন্তাভাবনায় ধর্ম নিয়ে তোলপাড়ের আকর্ষণ দেখা যায়নি।

ছেলেকে হিন্দু কলেজে পড়াবার সাধ্য ঠাকুরদাসের ছিল না। সেখানে মাসিক বেতন পাঁচ টাকা, আর ঠাকুরদাসের মাসিক আয় দশ টাকা। আর্থিক প্রতিকূলতা তো ছিলই। তা ছাড়া ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল ঈশ্বর সনাতন সংস্কৃত পণ্ডিতের বংশানুক্রমিক বৃত্তি গ্রহণ করে নিজস্ব টোল চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। তার জন্য সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাই যথোপযুক্ত। গরিব মধ্যবিত্ত সীমাতেই বাঁধা ছিল মেধাবী পুত্রকে নিয়ে ঠাকুরদাসের আকাঙ্ক্ষা। দারিদ্র্যের নিদারুণ চাপেই তো ঠাকুরদাস বংশানুক্রমিক বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হন। পরম্পরার সেই ভাঙন জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র আবার জুড়ে দেবেন সেই অভিলাষেই ঠাকুরদাসের স্বপ্নের শেষ।

ঈশ্বরচন্দ্র অবশ্য শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায় পিতার বাসনার সীমাকে অনেক দূর পেরিয়ে গিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের আধুনিকীকরণ, বাংলাস্কুলের প্রসার ও উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং প্রকাশ, মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা সবই বিদ্যাসাগরের জীবনভর কীর্তি। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার আগেই তো তিনি বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হলেন। তবে বিদ্যাসাগর যখন ছাত্র, তখন সংস্কৃত কলেজ ছিল গরিব ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাইনে দিতে অক্ষম সেই ছাত্ররা সরকারি ভাতার (stipend) ওপর নির্ভরশীল। এমন কি মেকলের সহযোগী ট্রেভেলিয়ন তাঁর একটি রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের 'ভাড়া করা ছাত্র' (hired students) বলে উপহাস করেছিলেন। পাশেই হিন্দু কলেজে তখন উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেদের সমাবেশ, আর ইংরেজি শিক্ষার

রমরমা আয়োজন।

এই তো বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন ; তাঁর মতো প্রখর বুদ্ধি এবং অনুভূতি-প্রবণ ছাত্রের মনে এই পরিবেশের কী ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার কোনো সরাসরি তথ্যপ্রমাণ আমাদের নেই। তবে নিজের পারিবারিক পটভূমিতে জীবনের গতিপ্রকৃতিতে বিদ্যাসাগরের কাছে চারপাশের বহু ঘটনায় একটা ছিন্নমূল অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। দর্শনসর্বস্ব ধর্মবিশ্লেষণ, ইংরেজিপনার বাহুল্যে ধর্মান্তরের ঝোঁক আর সনাতনপন্থীদের আচারের অত্যাচার এসবের মধ্যেই নানা রকম সীমাবদ্ধতার নজির ছিল। পরাধীন নিরুপায় অবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার আকর্ষণ তো অনেক ; কিন্তু সেই জ্ঞানের দর্পণে সমাজের বিন্যাস এবং বিবেকের সামঞ্জস্য উপনিবেশের অর্গলে অর্গলে কোনো সার্থক অবলম্বন খুঁজে পায় না।

ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতাতে কলকাতার একটা দ্বৈত রূপ বিদ্যাসাগরের কাছে স্পষ্ট হয়ে থাকবে। নতুন জ্ঞান বিদ্যার সুযোগ তিনি গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক পরিবেশে বিত্তের বিকার, ইচ্ছার বিশৃঙ্খলা আর গৌণ আনুগত্যের প্রভাব থাকতে বাধ্য। নব্যজ্ঞানের পীঠস্থান কলকাতাই তো আবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশ্লেষণে ল্যাম্পট্যবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা বলে গণ্য হয়েছিল। এলোমেলো জীবন সংস্কৃতির লক্ষণ যে কেবল লাম্পট্যেই দেখা যেত তা নয়। ধর্মসংস্কারের প্রশ্নেও দেশব্যাপী অনুকূল পরিস্থিতি নির্মাণের একটা দায় থাকে, তা সে প্রতিবাদ বা সম্মতি যে প্রেরণাতেই যুক্ত হোক। সে দায় থেকে বিচ্যুতিতে নানা স্ববিরোধের সমস্যা। সমকালীন ধর্মচেতনার প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের অবস্থান তাঁর চারপাশে এরকম স্ববিরোধের অনুষঙ্গেই আমরা খুঁজতে পারি।

রামমোহন পরবর্তী ব্রাহ্ম নেতৃত্বও স্ববিরোধ থেকে মুক্ত নন। বেদের অপৌরুষেয়ত্বে এবং উপনিষদের প্রত্যাদেশে আস্থার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনার ধর্মকে মেলাতে চান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে রীতিনীতি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় হিন্দু রক্ষণশীলতার সঙ্গে রাজা রাধাকান্ত দেবের অনেকটা সহমত ছিল। রাধাকান্ত দেব বহুদিন তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যও বটে। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাঁর সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হননি। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদকে মেলানোয় অক্ষয়কুমারের সম্মতি ছিল না। বিদ্যাসাগরও বেদান্ত আর সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন মনে করতেন।

বেদ এবং তার শিরোভাগ উপনিষদ থেকে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তত্ত্ব সমাবেশেই দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৯-এ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যা অনুশাসন এবং তা মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি থেকে সংকলিত। এসব গ্রন্থের অবলম্বনে যে ধর্মপ্রচার তা নিয়ে মতভেদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিচারকমণ্ডলীতে দেখা দেয়। সেই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'

ধর্মচেতনাকে পুরোপুরি যুক্তিগ্রাহ্য ব্রহ্মজ্ঞানে সমন্বিত করবার প্রচেষ্টায় নানা বাধা এসে পড়ে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নরকল্পতায় একটা পৌরাণিক সামঞ্জস্যর আশ্রয় থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী, প্রত্যক্ষবোদ্ধা, জীবনভোগী লোকমানসের সঙ্গে ঐ সামঞ্জস্যের যোগাযোগ জীবনের অজস্র খণ্ডবৈচিত্র্যকে বিশিষ্ট স্বীকৃতি দেয়। এ যেন সাধারণ আবেগ, অনুরাগ, বিক্ষোভ, ভক্তিকে আশ্রয় করেই ধর্মের নির্মাণ। ইহলোকের ভোগসুখ তার প্রেরণায় বঞ্চিত নয়। আবার কামনাবাসনার বন্ধন পেরিয়ে একান্ত অধ্যাত্ম সাধনায় মোক্ষপ্রাপ্তির পন্থাও হিন্দু ধ্যানধারণায় স্বীকৃত। অধ্যাত্মের এই রীতিনীতিতেই ব্যক্তির উদ্যম বড় ভূমিকা নেয়। অন্য স্তরে লোকায়ত জীবনধারায় বারো মাসে তের পার্বণের কর্মকেন্দ্র। সে পরম্পরায় সামাজিক জীবনে বিধানেই সকলে আগাগোড়া জড়িত।

ব্যক্তির ভূমিকাকে নিছক সমষ্টির আনুগত্য থেকে মুক্ত করতে চান রামমোহন। মানুষের রূপ আর দোষগুণে ঠাকুর দেবতারাও সমান অংশীদার এমন বহু পুরাণ কথার অবলম্বনে পৌত্তলিকতার আশ্রয় তৈরি হয়। তেমন নরকল্পতার অনুসরণে ধর্মের সঙ্গে ন্যায়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়ে যায়। তাই রামমোহন গৃহস্থের ধর্মকেও অদ্বৈত ব্রহ্মের ধ্যানে সংযুক্ত করতে চান, যেন হিন্দু ঐতিহ্যের সেই মোক্ষনিষ্ঠ অধ্যাত্ম বিবেক সংসারের দৈনন্দিনেও সতত প্রেরণা হতে পারে। যুক্তির গাঁথুনিতে রামমোহন ধর্মচিন্তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌকর্যে নির্মাণ করলেন। সব যুক্তির আরম্ভে কিন্তু এক থেকে একাধিক ধরতাইয়ের প্রয়োজন। রামমোহনেরও তা লেগেছিল। যেমন সতীদাহ নিবর্তনের যুক্তিতে তিনি সনাতন শাস্ত্র ধরে চলেন। আর গৃহস্থের পরম ব্রহ্ম নির্গুণ নয়, রামমোহনের সেই সিদ্ধান্তে শঙ্কর সূত্রের সমর্থন ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতদ্বৈধও সেই আরম্ভের সমস্যায় জড়িত। যৌক্তিকতাবাদী (rationalist) অক্ষয়কুমার বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা উপনিষদের

প্রত্যাদেশে আস্থা জ্ঞাপনের বিরোধী ছিলেন। ধর্মচিন্তার সঙ্গে যুক্তিকে মেলানোর বাধাগুলি বিদ্যাসাগর অস্বীকার করতে পারেন না। তাই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে প্রত্যক্ষ সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তারের কাজেই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আর বিদেশী রাজশক্তির আধিপত্যে যে আশঙ্কা বড় হয়েছিল, তার কথা অক্ষয়কুমার বলেন, 'আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রিস্টীয়ান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়।' জাতীয় আত্মপরিচয় রক্ষার তাগিদেই আবার পুরুষানুক্রমিক আচার বিচার গ্রহণ করবার প্রবণতাও দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে এমন কথা জানা গেছে যে অক্ষয়কুমারও জাতিভেদ প্রথার আশু বিলোপ সমর্থন করতে পারেননি।

ধর্মসংস্কারের উদ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় এবং বিশ্লেষণের গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। কিন্তু বুদ্ধির বিচার ছাড়াও ভক্তিমমতার উপলব্ধি এবং ন্যায়সঙ্গতির বিবেচনাও সেখানে জরুরী। তার তাৎপর্য কেবল তত্ত্ববিশ্বের কথা নয়। যুক্তির প্রয়োগে ব্রহ্মচিন্তার পরম আধ্যাত্মিক সমগ্রতা এক কথা, আর সেই অঙ্গীকারে মানুষের সামাজিক জীবন কতটা ঈপ্সিত পরিবর্তনের সম্ভাবনায়, অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হবে সে অন্য সমস্যা। ইংরেজ সাম্রাজ্যের অনুশাসনে বাঙালি মধ্যবিত্তের সব স্তরই বৃত্তির গৌণতায় আবদ্ধ ছিল। ওপরের স্তরে বিত্তের প্রাচুর্য অসম্ভব নয়। কিন্তু তার সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের আদৌ কোনো সৃষ্টিশীল যোগাযোগ ছিল না। জমিদারি, তেজারতি, ছোটোবড় সরকারি চাকরি, মাস্টারি, ওকালতি ইত্যাদি কোনো বৃত্তিতেই সামাজিক উৎপাদনে প্রাধান্যের লক্ষণ নেই।

এরকম সামাজিক, অর্থনৈতিক গৌণতার প্রতিকূলতায় বাঙালী মধ্যবিত্তের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াস আর তাঁদের আলোকপ্রাপ্তির (enlightenment) আগ্রহ আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তিতে বঞ্চিত থাকে। ইংরেজি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবে নাগরিক সমাজের (civil society) লক্ষ্য মধ্যবিত্তকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক অবরোধের মধ্যে তার কোনো ভিত্তিভূমি গড়ে উঠতে পারে না। ধর্মশাস্ত্র আর বেদবেদান্তের বিতর্কে আধিবিদ্যক (metaphysical) ক্ষেত্রটাই বড়। আমাদের ইংরেজ-পূর্ব সমাজ গড়নের নিজস্ব কোনো সঙ্গতির অন্বেষণ তেমন আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল না। এরকম অবহেলার সমস্যা আছে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ঐতিহ্য নিয়ে আধিবিদ্যক চিন্তার

সঙ্গে ভিনদেশী যুক্তির সংমিশ্রণ ঘটে।

তার আবেদন আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছয় না। তাদের অবস্থা তো আগাগোড়া ঘোর তিমিরেই নিমজ্জিত। তাই যুক্তির স্বনির্ভরতায় সাড়া না দিয়ে তারা পুরাণ ভাবনার আস্থা আঁকড়ে থাকে। তার সমষ্টিপ্রধান তাৎপর্য অবশ্য অনেকটা ওলটপালট হয়ে গেছে। তাই চলে এক আস্থারিক্ত, বিবেকশূন্য জগতে কেমন এক পৌরাণিক সামঞ্জস্যের মরিয়া অন্বেষণ। অন্যপক্ষে ন্যায়সঙ্গত স্বাবলম্বনের মধ্যবিত্ত আদর্শ কোনো সুদৃঢ় সামাজিকতায় প্রতিষ্ঠা পায় না। জীবনজীবিকার সৃষ্টিছাড়া গৌণতায়, বিদেশী প্রভুত্বের প্রতাপে সে আদর্শের অসঙ্গতি বারবার ধরা পড়ে।

তেমন অসঙ্গতির ব্যর্থতা কেশবচন্দ্র সেনের মতো বিদ্বান্, কর্মবীর ধর্মীয় নেতার ক্ষেত্রেও প্রকট। সমাজ সংস্কার, স্ত্রী শিক্ষা এবং সাংবাদিকতার নানান ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও আদর্শ অনেক উজ্জ্বল ব্রাহ্ম তরুণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গৃহের পরিচ্ছন্নতা, প্রকাশ্য সামাজিক জীবনে মহিলাদের যোগদান, চোদ্দ বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে না হওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন এমন অনেক উদ্যোগেই কেশবচন্দ্রের ভূমিকা এবং তাঁর তরুণ সহকর্মীদের উৎসাহ বিশিষ্ট মর্যাদা পায়। হিন্দু শাস্ত্রবিধি ও আচার ব্যবস্থার বাইরে, বিধবা বিবাহের আয়োজন এঁদের উদ্যোগে সফল হয়েছিল। ১৮৭২-এ সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট চালু হলো। হিন্দু বিবাহবিধি অনুযায়ী বিধবাদের বিয়ের ব্যয়ভার যোগাতে যোগাতে বিদ্যাসাগর তখন বঞ্চনায় ঋণে পর্যুদস্ত। সব প্রচলিত ধর্মে অনাস্থা প্রকাশের বাধ্যবাধকতাকে বাদ দিলে বিদ্যাসাগরও এই নতুন আইন অনুযায়ী বিধবা বিবাহ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় সহকর্মী ছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র এবং তাঁর তরুণ অনুগামীদের সমাজ সংস্কারের উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না। ব্রাহ্মরা উপবীতের মতো জাতিভেদের কোনো চিহ্ন ধারণ করবেন না, কেশবপন্থীদের এই প্রস্তাবেও দেবেন্দ্রনাথ সম্মত হননি। ১৮৬৫-তে ব্রাহ্মসমাজ দু-ভাগে ভেঙে যায়। কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। নেতৃত্বে কেশবচন্দ্রের একাধিপত্যের প্রবণতা প্রকাশ পেল। নিজেকে অবতারের পরিচয়ে শনাক্ত করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। বৈষ্ণব সংকীর্তন থেকে খ্রিস্টান ত্রিত্ববাদের (trinity) ধারণায় সচ্চিদানন্দের মিল খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত নানা মিশ্রণে তিনি নিজস্ব ধর্মমতের সার্বভৌমত্ব বানাতে চান। কেশবচন্দ্রের তরুণ

অনুগামীদের মধ্যে বিক্ষোভ অসন্তোষ শুরু হলো।

ঐ বিরোধ একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় যখন কেশবচন্দ্র তাঁর কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের নাবালক মহারাজার বিয়েতে রাজি হন। কন্যার বয়স তখনও চোদ্দর কম। ১৮৭২-এর যে নতুন আইনে কেশবচন্দ্র এবং তাঁর তরুণ সহযোগীদের উদ্যোগ উৎসাহ সমর্থনের অন্ত ছিল না তাতে কিন্তু চোদ্দ বছরের নীচে মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়। উপরন্তু কুচবিহার বিবাহে হিন্দু আচার অনুষ্ঠান প্রাধান্য পেয়েছিল। ইংরেজ শাসনের প্রতি অপরিসীম আস্থা ও ভক্তির মানুষ কেশবচন্দ্র। তাঁর কন্যার সঙ্গে কুচবিহার মহারাজার বিয়ে হলে দেশীয় রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আজ্ঞাধীন থাকবে তেমন বিশ্বাসেই ইংরেজ সরকার ঐ বিয়ের উদ্যোগ নেয়। ব্রিটিশ রাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ কেশবচন্দ্রের সাধ্যাতীত। সেই ইচ্ছা কিন্তু কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের নীতির প্রতিকূল। এমন অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজেও ভাঙন লাগল। তরুণ সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মদের নতুন সংগঠন হলো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আর কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজ।

উনিশ শতকে ব্রাহ্ম ধর্মসংস্কারের চিন্তায় ও আন্দোলনে বুদ্ধিবাদী প্রবণতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। 'তুহ্‌ফৎ'-এর সূচনায় ব্যাপক এবং বৃহত্তর ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে রামমোহনের আত্মীয়তা লক্ষ্যণীয়। নিজের পরবর্তী চিন্তাধারায় রামমোহন বৈদান্তিক বিশ্লেষণ আর শাস্ত্রীয় অবলম্বনকে বেশি গুরুত্ব দেন। তবে সমাজহিতের আদর্শ তাঁর কাছে যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছিল, যদিচ এদেশে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি সমর্থনে, অবাধ বাণিজ্য নীতি নিয়ে পক্ষপাতে, লবণ আমদানির অনুকূল যুক্তিতে, অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের আশ্রয়ে এবং সহযোগিতায় রামমোহন দেশের মঙ্গল নির্দেশ করলেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় ব্যক্তির ধ্যানমার্গই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। কাঙাল হরিনাথের মন্তব্যে জানা যায়, 'দেবেন্দ্রিয় মত এই যে, ব্রহ্ম কি ধর্ম্মের সহিত জমিদারীর কোনো সম্বন্ধ নাই। ...সুতরাং প্রজার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে তৎপ্রতি ধর্ম্মের মত কোনো ক্ষমতাই নাই, সর্বত্র যাঁহার চক্ষু সেই ব্রহ্মও তাহা দেখিতে পান না।' (আবুল আহসান চৌধুরী ১৯৮৮ : ৬৪-৬৫) কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে সমাজসংস্কারের প্রেরণা জোর পেয়েছিল। কিন্তু কুচবিহার রাজপরিবারে নাবালিকা কন্যার বিয়েতে সম্মত হয়ে তিনি নিজেই নৈতিক সঙ্গতির আদর্শ বজায় রাখতে পারেননি।

উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ ষাট বছর ইংরেজ শাসনের মঙ্গলজনক অবদান সম্বন্ধে গভীর আস্থার বশবর্তী ছিলেন বাংলার নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মোক্ষপ্রাপ্তির

সঙ্গে ব্যক্তির একান্ত অধ্যাত্ম সাধনার নিবিড় সম্পর্ক হিন্দু ধ্যানধারণার এক অবিচ্ছেদ্য অবলম্বন। অন্য স্তরে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী সমাবেশে, তার পৌত্তলিক পূজাপার্বণের কর্মকাণ্ডে হিন্দুধর্মের লোকায়ত নির্মাণ। ব্যক্তির অধ্যাত্ম সাধনায় মুক্তির আদর্শকে সমাজ সংসারের জীবনযাত্রায় গ্রথিত করতে চান রামমোহন। সংসার বৈরাগ্যে নয়, জীবনযাত্রায় সঠিক ঈশ্বরচিন্তা আর ব্রহ্মোপাসনাতেই তেমন অধ্যাত্ম সাধনার উপায়। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের আতিশয্য এবং অপচয় থেকে অব্যাহতি প্রয়োজন। উপাসনার কার্যক্রমে সমাবেশ থাকলেও তাতে ব্যক্তির নিভৃতি ক্ষুণ্ণ হবে না। তেমন নিভৃতির প্রতিকূলতা দূরীকরণ ছিল রামমোহনের ধর্মসংস্কারের অন্বিষ্ট। ধর্ম যেন সমাজ জীবনে ব্যক্তির স্বস্তিকে (social comfort) ব্যাহত না করে। ইংরেজ আনুকূল্যে নিজের জীবনে উন্নতির যে অভিজ্ঞতা, তা সারা দেশের পক্ষে সত্য হবে এমনই ছিল রামমোহনের আস্থা। সেই আস্থাতেই তাঁর ধর্মচিন্তা এবং সমাজহিতের আকাঙ্ক্ষা মিলতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এবং আরো অনেকেই ইংরেজ শাসনের সেরকম ফলাফলে বিশ্বাসী ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ তিরিশ বছরে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বাঙালী মধ্যবিত্তের আস্থাতেই ভাঙন ধরল। চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত আর ইংরেজি শিক্ষিতের রাজকার্যে নিয়োগ থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। জমিদারি আর মধ্যস্বত্বের বোঝা কৃষিতে উৎপাদনের বিকাশ রুদ্ধ করে দেয়। আবার সস্তায় কলে তৈরি বিলাতি সুতো এবং কাপড়ের আমদানিতে দেশজ বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ হলো। তাই কৃষির ওপর জীবিকার নির্ভরতা বেড়ে চলে। অন্য অনেক দেশজ শিল্পেও বিনাশের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষিতের চাকরির সুযোগও প্রার্থী সংখ্যার তুলনায় কমে গেল। এসব ঘটনা পরম্পরায়, যা ছিল রামমোহনের বুদ্ধিবাদী সংস্কারের অবলম্বন, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সেই আস্থাই আর বজায় থাকে না।

এই পরিস্থিতিতে হিন্দু প্রতিক্রিয়ার জোর বাড়ে। অক্ষয়কুমার সরকার, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামনি ছিলেন নানা স্তরে সেই প্রতিক্রিয়ার প্রবক্তা। পাশ্চাত্য জ্ঞানের কাছে হিন্দুদের শিখবার কিছু নেই, এই ছিল অনেক সময় তাঁদের বক্তব্য। আবার হিন্দু ভাববাদ এবং পজিটিভিজম-এর সমন্বয় সাধনে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুত্বের স্বপক্ষে বিদগ্ধ বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শতাব্দী-ব্যাপী অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত নিজেদের কোনো সদর্থক সামাজিক

ভূমিকা খুঁজে পায় না। গোড়ার কথায়, সেখানেই তো পরাধীনতার নিষ্ফলতা। তাই কি হিন্দু প্রতিক্রিয়া এত সোচ্চার হয়ে উঠল? আর তা আমাদের জাতীয়তা-বাদের সূচনাকে অনেকটা প্রভাবিত করল?

১৮৭৩-এ রাজনারায়ণ বসুর মতো প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতাও বললেন, 'নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল।' হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার কথায় তিনি বলেন যে নানা স্তরের লোককে এক সম্প্রদায়ভুক্ত করতে পারাই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। ব্রহ্মজ্ঞানী থেকে পৌত্তলিক পর্যন্ত সকলেই এই স্তরবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্যে একই ঐতিহ্যের বিস্তারে ব্রহ্মজ্ঞানী এবং পৌত্তলিকের ভেদাভেদ দুরপনেয় নয়। পৌত্তলিকতা পাপ কর্ম নয়, তা কেবল ভ্রম। উপদেশ দিয়ে অজ্ঞানতা মোচনে আর জ্ঞানের উন্নতিসাধনে হিন্দু ধর্মের ব্যাপ্তি এবং সার্থকতা।

শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশকে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে আস্থার সংকটের কথা বলেছি। তার বোঝাপড়ায় রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও ধর্মকথার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহারের মাধুর্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু মানুষকে অভিভূত করেন। কামারপুকুরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে তাঁর জন্ম। পাঠশালা স্কুলের লেখাপড়া ছিল না বললেই চলে। বর্ধমান থেকে পুরী পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের পথে পড়ত কামারপুকুর। এ পথে বহু সাধু সাধকদের আনাগোনা ছিল। তাঁদের কাছে ধর্মকথা, পুরাণ-কাহিনী, কথকতা শুনবার সুযোগ নিশ্চয় মিলত। তেমন সব লোকসমাবেশেই সম্ভবত রামকৃষ্ণের প্রাথমিক শিক্ষা। দক্ষিণেশ্বরেও অনেক সাধক মানুষের সঙ্গে তাঁর চেনাশোনা হয়।

তবে জ্ঞানের উৎস যাই হোক না কেন, অনুভবের সাবলীল প্রকাশে রামকৃষ্ণ ছিলেন অসামান্য; অজস্র চিত্রে, কাহিনীতে পরিপূর্ণ তাঁর কথার ধারায় দ্বৈত অদ্বৈত, পৌত্তলিকতার পক্ষবিপক্ষ, ন্যায় অন্যায়, পাপপুণ্য নিয়ে কোনো বুদ্ধিবাদী নিরূপণ নেই; শিশুর সারল্য আর কথা থেকে কথার প্রত্যক্ষে প্রতীকে তা মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যের সর্বাঙ্গে ঈশ্বরের বিরাজ দর্শন করে। আর যত পরিত্যজ্যই হোক, কামিনীকাঞ্চন বাদ দিয়ে তো আর গার্হস্থ্য হয় না। তাই মাপেজোখে সে অনুমোদনও গৃহস্থের ভগবানে মিলে যায়। এ যেন মধ্যবিত্তের পরাধীন গৌণতার যন্ত্রণায় এক আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা; আর মনের গঠনে আধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্যও কোনো বিশিষ্ট অর্জনের বস্তু নয়। ভক্ত গৃহস্থের জীবন যাপনের গতিপ্রকৃতিতেই সে অধিকার অনিবার্য।

সারূপ্যের সন্ধানে হিন্দুত্ববাদীরা অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তির দিকে ঝুঁকেছিলেন। তার চেয়ে শান্ত আপোশেই রামকৃষ্ণ হিন্দু আত্মপরিচয়কে গাঁথতে চান। নানা ধর্মের সমন্বয়ে কোনো নতুন ধর্মের নির্মাণ নিষ্প্রয়োজন। প্রতি ধর্মেই ঈশ্বরকে বিভিন্ন উপায়ে সাধনার কোনো না কোনো সমীচীন পথনির্দেশ রয়েছে। পরাধীনতার গৌণতায় বিপর্যস্ত এক বিকলাঙ্গ নাগরিক সমাজের ব্যক্তিমানুষ তখন কিছু একটা আশ্বাস খুঁজছে। অথচ গৌণতার প্রতিবাদে নিজেদের অবনত অবস্থাকে ভেঙে গড়ার যোগ্যতা তার নেই। বুদ্ধিবাদে ভরসা মেলে না। আবার বহু স্তরের সমন্বয়ে লোকায়তের যে ব্যঞ্জনায় জীবনের অন্য প্রতিশ্রুতি, তার অঙ্গীকারের পথেও মধ্যবিত্ত সমাজে বাধার অন্ত নেই। সেই সীমাবদ্ধ জীবনও ঠাকুরের অনুগ্রহে বঞ্চিত নয়। লোকায়ত রসেবশে মাঝারি-গৃহস্থের মাপজোখ মিলিয়ে তেমন ভরসাই যেন রামকৃষ্ণ দিচ্ছেন। তবে ইহলোকের এরকম ধর্মীয় আপোশেই হয়তো অন্য স্তরে সন্ন্যাসীর জীবন, জাতীয়তায়, মানব সেবার প্রেরণায়, মোক্ষের অন্বেষণ করে। সেখানেই বিবেকানন্দের মত ও পথ।

বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে একবার রামকৃষ্ণ এসেছিলেন। অভ্যর্থনায়, আপ্যায়নে বিদ্যাসাগর আন্তরিক সৌজন্যের পরিচয় দেন। নানা বিষয়ে রামকৃষ্ণ কথা বলেন, দু-একটি গানও করেন। বিদ্যাসাগর শ্রোতা। তিনি সামান্যই কথা বলেন। বিদায়কালে রামকৃষ্ণের রাসমণির বাগানে আমন্ত্রণের উত্তরে বিদ্যাসাগর রাজি হলে আবার রামকৃষ্ণ বলেন, 'কিন্তু আপনি জাহাজ। কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।' রামকৃষ্ণ নিজেদের বলেন জেলে ডিঙি যা খালবিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারে। (শ্রীম ১৯৮৩ : ১৬১) রামকৃষ্ণ এবং বিদ্যাসাগরের আর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছিলেন, ধর্মের নির্মাণে বিনির্মাণে তাঁর তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি। মনে হয় দেশজোড়া নানা সমস্যার বোঝাপড়ায় তিনি সরাসরি উদ্যোগের পক্ষপাতী ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ে দার্শনিক কূটতর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরকে কোনোদিন খুব আকর্ষণ করেনি। গরিব মধ্যবিত্তের কঠোর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে বিদ্যাসাগর পরিচিত। তিনি হিন্দুদের মতো শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সমস্ত করতেন। গলায় তাঁর উপবীত ছিল। নিরীশ্বরবাদ বা অজ্ঞাবাদ জাহির করবার কোনো আগ্রহ তাঁর হয়নি। তবে সমকালীন ধর্ম আন্দোলন আর ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় নিয়ে চিন্তার সৌধ নির্মাণেও

বিদ্যাসাগর উৎসাহী ছিলেন না। এখানেই সম্ভবত গরিব ঘরের ছেলে বিদ্যাসাগর অযথা বাগাড়ম্বরে বিরত হতেন।

অবশ্য বিদ্যাসাগরও মনে করেছেন ঐতিহ্যের পরম্পরায় শাস্ত্রেই আছে বহুজনের সম্মতির আকর। শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের আবর্তে তাঁর সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের নিচে তাকালে বিদ্যাসাগর নিশ্চয় সেই ব্যবস্থার অণুপরমাণুতে বিধবা বিবাহের অনুকূল আচার বিধানের প্রচলন দেখতেন। তবে উচ্চবর্ণের শৃঙ্খলার মধ্যে সংস্কারই ছিল বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য। আর নিম্নস্তরের দৃষ্টান্তের জোরে উচ্চকোটির শৃঙ্খলা ভাঙবার প্রস্তাব তাঁর ছিল না। ১৮৯১-তে সরকার বারো বছরের কম বয়সী মেয়েদের সহবাস-সম্মতি নিষিদ্ধ করবার প্রস্তাব দিলে তুমুল প্রতিবাদ হতে থাকে। রোগশয্যা থেকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর শাস্ত্র বা ধর্মীয় আচারের (religious usage) বিরুদ্ধে না যাওয়ার সুপারিশ করেন। তাঁর মতে কন্যার প্রথম রজোদর্শনের পূর্বে স্বামী স্ত্রীর যৌনমিলন নিষিদ্ধ করলেই বিবাহের নিষ্পত্তি আইনসিদ্ধ হবে। ১৮৫০-এ প্রথম একটি প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ও লোকাচার উভয়কেই বাল্য-বিবাহের দোষের জন্য দায়ী করেছিলেন। তাই ১৮৯১-এর সুপারিশে বিদ্যাসাগর যেন এক অর্থে হার মানলেন।

সূচনায় সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য নির্ণয়ে বিদ্যাসাগর কোনো আপোশ করেননি। ঔপনিবেশিক সমাজ আর রাষ্ট্রের শক্তিশৃঙ্খলায় এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা উদ্যম নব্য নাগরিক মধ্যবিত্তের ছিল না, যা বিদ্যাসাগরের অন্বিষ্টকে সফল করতে পারে। সমকালীন ধর্মচেতনার শক্তি ছিল না যে কোনো ব্যাপক পরিবর্তনে কৃতকার্য হবে। ঈশ্বর প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'তাঁকে তো জানবার যো নাই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত, সকলে যদি সেরূপ হয় পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।' (শ্রীম ১৯৮৩ : ১৫৮) জীবনভর কর্মনিষ্ঠ, নির্ভীক, নির্লোভ বিদ্যাসাগর সেই সাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন। পরিপার্শ্বের আনুকূল্য তিনি পাননি। একবার বলেছিলেন, তাঁর দেশের লোক এত নিষ্কর্মা ও অপদার্থ জানলে তিনি কখনোই বিধবা বিবাহের মতো উদ্যোগে তৎপর হতেন না। এই নিঃসঙ্গ ক্রোধ শেষ পর্যন্ত তার একমাত্র আধার পেল বিদ্যাসাগরের ট্র্যাজিডিতে।

আধুনিকের সীমানায় বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকে বাঙালি সমাজের আধুনিকীকরণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অনেক আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। ইংরেজ অধিকারের জের ধরে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সূচনা। ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নব্য-মধ্যবিত্তের চিন্তায় এল যৌক্তিকতা (rationalism), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং মানব অধিকার (rights of man) প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা। ভাবজগতের তেমন পরিবর্তন এবং তার অনুকূল সমাজ-বিন্যাসেই আধুনিকীকরণের পরিচয়।

ইয়োরোপে আধুনিকতা বলতে যে যুক্তি, বিজ্ঞান এবং ব্যক্তিপ্রাধান্যের প্রতিপত্তি তা এক ব্যাপক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতায় সংগতি অর্জন করে। যুক্তির জোরেই প্রকৃতির ওপর মানুষের বৈজ্ঞানিক আয়ত্তি এবং প্রয়োগ আর সেই সঙ্গে জড়িত সামাজিক উৎপাদনের অভূতপূর্ব বিকাশ। সেটাই ইয়োরোপের রিফর্মেশন, রেনেসাঁস, আলোকপ্রাপ্তি (enlightenment), শিল্পবিপ্লব মিলিয়ে পর্ব থেকে পর্বান্তরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে ক্রমান্বয়ে পুঁজির (capital) সামাজিক নেতৃত্ব বিস্তারের ইতিহাস।

পুঁজি তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্যে নাগরিক সমাজের (civil society) গঠন ও বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যুক্তির রাজত্ব, বিজ্ঞানের প্রয়োগ, উৎপাদনের অগ্রগতি আর স্বাধীন বাজারের নিয়ন্ত্রণেই নাগরিকদের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ব্যক্তি-স্বার্থ এবং সমষ্টির কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে। এরকম পরিচালনায় নির্দিষ্ট হয় পুঁজির সামাজিক সমগ্রতা, পদে পদে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত তার নাগরিক সমাজের স্বাবলম্বন।

তখন প্রকৃতি, সমাজ ও জীবনের নানা স্তরে যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিয়ামক ভূমিকা স্বীকৃতি পায়। তেমন আস্থার অবলম্বনে নাগরিক মানুষ ধর্মতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতাপ থেকে মুক্ত আত্মকর্তৃত্বের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে-জগতে পুঁজির গতিবিধির নৈর্ব্যক্তিক সমগ্রতাতেই সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণের নির্বন্ধ। ব্যক্তিস্বার্থের চলাচলে পরার্থেরও সার্থক নিষ্পত্তি, এমন আস্থায় সমাজের অণুপরমাণু পুঁজির সামগ্রিক আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে।

পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ অবশ্য নাগরিক সমাজেরই অন্তর্গত। সে-সমস্যা সর্বজনীন স্বাধীনতা, সাম্য আর সম্পত্তির আদর্শেই বাদ সাধে। বিদ্যাসাগরের সমকালীন বাঙালি সমাজের অসম্পূর্ণতা অবশ্য আরও গোড়ার ব্যাপার। সেখানে প্রাক্তন কৌমসমাজের (community) আশ্রয় ভেঙে পড়ছে, অথচ নাগরিক সমাজের বিকাশও নানাভাবে অবরুদ্ধ। ইংরেজ সাম্রাজ্যের তাগিদ মতো হলো রাষ্ট্রের গঠন। তার বৈধতার দায়ে নাগরিক সমাজের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠা প্রয়োজন। কিন্তু পরাধীন মধ্যবিত্ত তো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রজা। তাঁরা নাগরিক নন। পুঁজির অসম্পূর্ণ বিকৃত প্রাধান্যে সেই অবস্থার ব্যাপক প্রকাশ।

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক উৎপাদনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোনো ধারাবাহিক সৃষ্টিশীল ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিজেদের উন্নতিকে কোনো বৃহত্তর রূপান্তরের সঙ্গে মেলাবার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। মধ্যবিত্তের বিত্ত ও বৃত্তির সঙ্গে উৎপাদনের পরিপূরক সম্পর্ক নিতান্ত ক্ষীণ। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিদারুণ গৌণতায় আচ্ছন্ন এই মধ্যবিত্তের এক্তিয়ারে কোনো নাগরিক সমাজের ভিত পাকা হয় না। এমন অবস্থা আধুনিকীকরণের প্রেরণা ও উদ্যোগকে বিপর্যস্ত করে।

ইয়োরোপীয় ধাঁচের পুঁজিবাদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠা সারা পৃথিবীতে হওয়ার নয়, কয়েক শতাব্দী ধরে এই সত্যের ভার আমাদের ইতিহাস বয়ে চলেছে। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিতে পুঁজির তেমন কোনো বিশ্বজনীন ভূমিকার প্রকাশ নেই। ইয়োরোপের যুক্তিরীতি ও বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক সাফল্য বাঙালি মধ্যবিত্তকে আকর্ষণ করেছিল। রামমোহন বলেছিলেন ইংরেজশাসন যেন এক দৈব অনুগ্রহ! 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্রের মহাপুরুষ-বার্তা 'ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব'। 'বর্তমান ভারত' রচনায় বিবেকানন্দের উক্তি,

> যে সদাজাগরূক বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্য বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলণ্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরেজের থাকিবে এমন ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও শত শত আবার অর্জিত হইবে। (প্রসূন বসু প্রমুখ স. ১৩৯১ ব: ১০৬)

ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ার জোরে বৈষয়িক উন্নতি মধ্যবিত্তের কাম্য ছিল। সংস্কারপন্থী রামমোহন রায় থেকে রক্ষণশীল রাধাকান্ত

দেব পর্যন্ত কারও কাছেই তা উপেক্ষার বস্তু নয়। সেই অন্বিষ্টের সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্য আর ধর্মমতের সামঞ্জস্যবিধানের ব্যাপারেই নানা তর্কবিতর্ক মতভেদের আলোড়ন প্রকাশ পায়। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় আপ্লুত 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মতো তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগের ঝোঁকও দেখা যায়। শতাব্দীর শেষ তিন দশকে জাতীয় আত্মপরিচয়ের কথায় নানা প্রশ্ন উঠতে থাকে। তখন আবার প্রতীচ্যের ব্যাবহারিক সাফল্যের তুলনায় 'হিন্দু ভারতীয়' অধ্যাত্ম উৎকর্ষ প্রতিপাদনের চিন্তা প্রাধান্য পায়। অনেক রকম দ্বিধা দোটানায় ভাবাদর্শের জগৎ প্রক্ষিপ্ত সব যোগবিয়োগের দৃষ্টান্তে ভরে যায়।

এমন বহু দ্বন্দ্বে আকীর্ণ সামাজিক পটভূমিতে বিস্তৃত ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন পর্যায়। বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে তাঁর জন্ম। ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাস জীবিকার তাড়নায় পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলকাতায় এসে কাজ চলার মতো সামান্য ইংরেজি শিখে এক সওদাগরি হৌসে চাকরি শুরু করেন। মাসিক মাইনে প্রথমে ছিল দু টাকা। পরে দশ টাকা অবধি বেড়েছিল। আট বছর বয়সে গ্রামের মেধাবী ছাত্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র বাবার হাত ধরে কলকাতায় এলেন। তখন থেকেই এক কঠোর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হলো। বড়বাজারের দয়েহাটা অঞ্চলে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে আশ্রিতদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুরদাস এবং তাঁর বালকপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র।

ছাত্রজীবনের যে-বছরগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে বিদ্যার্জনের অধ্যায়ের পর অধ্যায় পেরিয়ে যান, তখন তাঁর বিদ্যায়তনের পাশে হিন্দু কলেজে মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার কার্যক্রম তুমুল উৎসাহে চলছে। সেখানে অবস্থাপন্ন ঘরের ছাত্রদের সমাবেশ। ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয় বুঝতেন তাঁর কলেজ গরিব ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাইনে দিতে অক্ষম সেই ছাত্রদের অনেকেই সরকারি ভাতার ওপর নির্ভরশীল। মেকলের সহযোগী ট্রেভেলিয়ন একটি প্রতিবেদনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভাড়া-করা ছাত্র (hired students) বলে উপহাস করেছিলেন।

জন্মসূত্রে কলকাতার বিদ্বান সম্ভ্রান্ত সমাজে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনো স্থান নেই। নিজের মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জোরে ছাত্রজীবন সমাপ্তির সময়েই তিনি বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হলেন। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের নিরন্তর নিষ্ঠা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের অবলম্বনে বিদ্যাসাগর জ্ঞানীগুণী সম্ভ্রান্ত মানুষের জগতে নিজের

প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সম্ভবত কলকাতা নগরের একটা দ্বৈত চরিত্র ছাত্রজীবনেই বিদ্যাসাগরের অনুভবে ধরা পড়ে। ইংরেজি শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ এই নগরে তৈরি হলো। তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট এক সমাজ যেখানে একদিকে বিত্তের অপচয়, জ্ঞানগরিমার বাহুল্য, আর অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাসের মতো পুরুষানুক্রমিক জীবিকা থেকে উৎসন্ন গরিব মানুষের দুরবস্থা।

সে-জগতে পুঁজির এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য পরাধীন প্রজাদের জন্য বশ্যতার বনিয়াদ পাকা করতে চায়। পুঁজির তেমন রাজত্ব কোনো নাগরিক সমাজের সংগতিতে জড়িত নয়। এমন অবস্থায় পাশ্চাত্যের যুক্তিরীতি আর জ্ঞানবিজ্ঞানে বহুর মধ্যে একের নির্ধারণের যে-সূত্র তার ঠিক হদিস মেলে না। নাগরিক সমাজে পুঁজির প্রাধান্যেই সেই ঐক্যসূত্রের উৎস। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজির অগ্রণী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ তার প্রভুত্ব কায়েম হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের গতিপ্রকৃতিতে তার নিদর্শন প্রকট।

বহির্বিষয়ক জ্ঞানের আকর্ষণ যাই হোক, তার যুক্তিতে সামাজিক রূপান্তরের সাধ্য পরাধীন মধ্যবিত্তের ছিল না। তেমন বিরুদ্ধতায় চিন্তারাজ্যের নির্মাণে বিনির্মাণে একটা কোনো নিষ্পত্তির অনুসন্ধান অনেক মনীষী করলেন। তা যেন ভাবের ঘরে অধ্যাত্ম ঐতিহ্য আর যুক্তিবাদী জ্ঞানকে মিলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা। তবে ধর্মসংস্কার, ধর্মান্তর এবং হিন্দু রক্ষণশীলতার ঘাতপ্রতিঘাতে যে-আলোড়ন কলকাতার সমাজে সমানেই চলছিল তার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। প্রাচ্যপাশ্চাত্যের দর্শনসর্বস্ব সমীকরণ, 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিচ্ছিন্ন সাহেবিপনার বাহুল্য আর সনাতনপন্থী গোঁড়ামী এমন কোনো পথেই বিদ্যাসাগরের কাছে সম্যক সমাজকল্যাণের সন্ধান ছিল না।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যে-নতুন পাঠক্রমের প্রবর্তন করেছিলেন তার সম্পর্কে ব্যালান্টাইনের (বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ) প্রতিবেদনের উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন। সংস্কৃত জ্ঞানের উন্নতি-কল্পে তা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর দৃঢ় মত যে, সাংখ্যবেদান্তের ভ্রান্তি বুঝবার প্রয়োজনেই বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ইয়োরোপীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাত্রদের একান্ত প্রয়োজন। এমন মন্তব্যে স্পষ্ট যে, বস্তুজ্ঞানবিহীন মেটাফিজিক্যাল দার্শনিক চিন্তায় বিদ্যাসাগরের সমর্থন ছিল না। ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে ভাববাদের কাল্পনিকতা তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি। এই প্রসঙ্গেই

বিদ্যাসাগর বলেন যে, এদেশের সনাতন চিন্তাধারার সঙ্গে কোনো আপোশের দরকার নেই ; যুক্তিবাদী বস্তুনিষ্ঠ দর্শনেই ছাত্রদের শিক্ষা ও মনন প্রকৃত সত্যের আধার অর্জন করবে।

বালক বয়স থেকেই কঠোর জীবনসংগ্রাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের নিত্য অভিজ্ঞতা। আট বছর বয়স থেকে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পায়ে হেঁটে চলে আসতেন সংস্কৃত কলেজ পর্যন্ত। বড়বাজার দয়েহাটার আশ্রয় থেকে তাঁর এই যাওয়া-আসা রোজদিনের ব্যাপার। জানি না এই পথ ব্যেপে কত বিচিত্র দেখাশোনা ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের দিনগুলি জুড়ে ছিল। চারপাশের সমাজে অভাব, অনাচার, অবিচার, অসংগতির তো অন্ত ছিলনা। ঈশ্বরচন্দ্রের দিনানুদৈনিক উপলব্ধির টানাপোড়েনে অ্যাবস্ট্রাক্ট তত্ত্ববিশ্বের আকর্ষণ ছিল না। প্রত্যক্ষের প্রেরণাতেই বিদ্যাসাগর কর্মের নির্দেশ পেয়েছেন। ভাববাদী কোনো সমগ্রের নির্মাণে তিনি জ্ঞানের স্বস্তি অন্বেষণ করেননি। সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ কিছু সমস্যার নিরসনেই তিনি বারবার দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন। দুর্বল নিরুপায় মানুষের প্রতি করুণায় মমতায় বিদ্যাসাগর সমাজের অণুপরমাণুতেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিতেন। পাশ্চাত্যের যুক্তি ও জ্ঞানকে তিনি সতত কোনো-না-কোনো প্রত্যক্ষদর্শী, জীবনধর্মী কর্মের প্রেরণায় উৎসর্গ করতে আগ্রহী। তেমন কাজের মধ্যেই বিদ্যাসাগর আধুনিককে চিহ্নিত করেন। মনে মনে বানিয়ে তোলা কোনো আধুনিকের ফতোয়া তিনি কোনোদিন জাহির করেননি।

২

শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত কলেজের আধুনিকীকরণ, বাংলা স্কুলের প্রসার ও উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগ, পাঠ্যপুস্তক রচনা আর প্রকাশ, মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা সবই বিদ্যাসাগরের জীবনভর কীর্তি। সংস্কৃত কলেজে নতুন পাঠক্রমের প্রবর্তন করেন বিদ্যাসাগর। ইংরেজি, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো। উচ্চপর্যায়ের বৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে নীতিশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনীতি স্থান পেল।

বিদ্যাসাগরের আস্থা ছিল ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃতের মিলিত জ্ঞান আর আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় বাংলা ভাষার বিকাশ এবং বাংলা গদ্য নির্মাণের সহায় হবে। এ-কাজে বিদ্যাসাগরের স্বকীয় অবদান কী অসামান্য তা আমরা জানি। সাহেবদের আড়ষ্ট সব পরীক্ষা থেকে মুক্ত বাংলা গদ্যরীতি

বিদ্যাসাগরের হাতে সাবালক চেহারা পেল। তাঁর রচনায় বাংলা বাচনের ধরন অনুযায়ী বাক্যের নির্মাণ গদ্যের সংগতিকে সুনিশ্চিত করে। গদ্যের এমন বিন্যাসে আমরা তো এক প্রত্যক্ষবোদ্ধা মনীষারই পরিচয় পাই।

সংস্কৃত কলেজে পাশ করা ছাত্ররা যাতে বিভিন্ন নতুন বৃত্তির উপযুক্ত হতে পারে সেটাও বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল। ইংরেজের বাংলা যে-পথে চলছিল তার সীমার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের ওই প্রচেষ্টা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে নিয়োগের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কথা বিবেচনার জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে আর্জি পেশ করেন। তাদের নিয়োগের পক্ষে বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির কথা বিদ্যাসাগর জানান।

বিদ্যাসাগরের নিজের অভিজ্ঞতায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পরিশ্রম ও ংকল্পের জোরে গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও বিদ্যাশিক্ষায় সফল হতে পারে। তাঁর পাঠ্যপুস্তকের রচনাবলীতে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব অপরিসীম। কষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়ে অতি দীনহীন অবস্থা থেকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছলেন, এমন সব বিদেশী চরিত্রের আলেখ্যে 'চরিতাবলী' নামে বিদ্যাসাগরের রচিত পাঠ্যপুস্তকটি পরিপূর্ণ। চরিত্রগুলি প্রায় সবই ইয়োরোপীয়। ভাবা যায় বহু স্তরে বিভক্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে গরিব ঘরের ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যাসাগরকে উদ্‌বুদ্ধ করত। কোনো বিকল্প সামাজিক নেতৃত্বের কথাও হয়ত বিদ্যাসাগর নিজের মতো করে ভাবতেন।

'চরিতাবলী' বইটিতে কোনো স্বদেশী চরিত্র না থাকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় আপত্তি করেন। জেনে হোক, না জেনে হোক, বিদ্যাসাগরের এই নির্বাচনে আরও একটি সত্যের সংকেত নিহিত থাকা সম্ভব। বর্ণভেদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো আপত্তি বিদ্যাসাগর কখনও করেননি। সংস্কৃত কলেজে সকল বর্ণের ছাত্র নেওয়ায় তাঁর নিজের আপত্তি ছিল না। শিক্ষক সমাজের বিরুদ্ধতার আশঙ্কায় বিদ্যাসাগর সব বর্ণের অধিকার অনুমোদন করেননি। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল।

যে-কোনো অবস্থা থেকে মানুষ নিজ গুণ ও যোগ্যতায় সাফল্যের শিখরে উঠতে পারে, 'চরিতাবলী'র জীবনীসমূহে সেটাই প্রতিপাদ্য। বর্ণশাসিত সমাজে সে-রকম উন্নতি প্রায় অবরুদ্ধ বলেই কি বিদ্যাসাগর 'চরিতাবলী'তে কোনো স্বদেশী চরিত্র নির্বাচন করেননি? আধুনিকের দোহাই দিয়ে বিদ্যাসাগর কোনো সংস্কারের কথা বলেন না। তবে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর

আচারের পরিবর্তনীয়তা নিয়ে যে দৃষ্টান্ত দেন তার বিশিষ্ট তাৎপর্য মনে রাখা উচিত।

বিদ্যাসাগরের বক্তব্য,

> …আমাদের দেশের আচার একেবারেই অপরিবর্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, সৃষ্টিকাল অবধি আমাদের দেশে আচার পরিবর্তিত হয় নাই ; এক আচারই পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বকালে এদেশে চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সংজ্ঞা তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পূর্বকালে শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে, শূদ্রের অপরাধের সীমা থাকিত না ; এক্ষণে সেই শূদ্র উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণেরা সেবাপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায়, সেই শূদ্রাধিষ্টিত উচ্চ আসনের নিম্নদেশে উপবেশন করেন। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ : ১৬১)

শাস্ত্রীয় মীমাংসার শর্ত মেনে বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের প্রস্তাব দেন। ঐতিহ্যের পরম্পরায় শাস্ত্র বহুজনের বিশ্বাসের আকর। বিদ্যাসাগর তাই মনে করতেন। সংস্কারের লক্ষ্য ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ। শাস্ত্রের সমর্থন নেই এমন কোনো সংস্কার সেখানে গ্রাহ্য হবে না। এই বিশ্বাস থেকে শাস্ত্রবিচার এবং তর্ক-বিতর্কে বিদ্যাসাগর কোনো ক্ষান্তি মানেননি।

একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর লেখেন, 'বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম'। বিধবাদের দুঃসহ কষ্ট, ব্রহ্মচর্যের যন্ত্রণা, আর ব্যভিচার ও ভ্রূণ-হত্যার পাপের কথায় বিদ্যাসাগর জোর দেন। পুনর্বিবাহ ছাড়া অবশ্য হিন্দু বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি নেই। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের ঘেরাটোপে তার কোনো উপায় ছিল না। নিজের কন্যার অকালবৈধব্যের পর বিদ্যাসাগর অনেকদিন কোনো আমিষ খাদ্য গ্রহণ করেননি এবং একাদশী পালন করেছেন। বাল্যবিধবাদের অসহনীয় ক্লেশের সমস্যাতেই বিদ্যাসাগর বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন।

সহবাস-সম্মতি আইনের (age of consent) ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবিহিত 'গর্ভাধান' সংস্কারের বিরুদ্ধে মত দেননি। সমাজসংস্কার বিষয়ে তাঁর জীবনের প্রথম প্রবন্ধ 'বাল্যবিবাহের দোষ'। সে-প্রবন্ধের আরম্ভে বিদ্যাসাগরের উক্তি,

> অষ্টমবর্ষীয় কন্যাদান করিলে পিতা-মাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়; ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মানুষ মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

আর 'এইরূপে লোকচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহ নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি'। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ : ৩)

এই প্রবন্ধের শাস্ত্রবিরোধিতা বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রচনায় নেই। ১৮৯১-তে সরকার থেকে মেয়েদের সহবাস-সম্মতির বয়স (age of consent) বাড়াবার প্রস্তাব উঠল। ১৮৬০-এর আইনে সম্মতির ন্যূনতম বয়স দশ বছরে নির্দিষ্ট হয়। সে-আইনের প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী ছিলেন। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় ন্যূনতম বয়স বাড়াবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ডাক্তারদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এ-দেশে বারো বছরেই অধিকাংশ মেয়ের যৌবনারম্ভ।

নতুন আইনের প্রস্তাব প্রবল বিরোধিতার সামনে পড়ে। আইনটি ছিল সকল ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কলকাতার বহু সভায় এবং জেলায় জেলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রেস কোর্স ময়দানে এক লাখের বিরাট সভা হয়। সংখ্যায় কম হলেও বিলটির পক্ষেও সরকারের কাছে আবেদন গিয়েছিল। কলকাতার ১৫০ জন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম মহিলার স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপিতে বড়লাট লর্ড ল্যান্‌সডাউনকে আইনটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাঁদের অনুরোধ ছিল যে আরো বাড়িয়ে সহবাস-সম্মতির বয়স চোদ্দ বছর করা প্রয়োজন। (The Statesman, Calcutta, March 19, 1891)।

হিন্দুদের আপত্তিতে প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এই আইনের প্রয়োগে শাস্ত্রবিহিত 'গর্ভাধান' সংস্কারের কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটবে। শাস্ত্রমতে কুলবধূ প্রথম রজস্বলা হওয়ার পরে চতুর্থ রজনীতে 'গর্ভাধান' বিধেয়। এই আইনে বারো বছরের আগে কোনো বধূ রজস্বলা হলে তার স্বামীর পক্ষে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য নিষিদ্ধ হচ্ছে। সরকার বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান। রাজবিধির প্রয়োগে গর্ভাধানের মতো ধর্মানুষ্ঠানে কোনো বাধা দেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রস্তাব করেন যে, স্ত্রী রজস্বলা হওয়ার আগে তার সঙ্গে সহবাস

দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হোক। কোনো বয়স বেঁধে দেওয়ার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন।

তাঁর বক্তব্য,

> অধিকাংশ বালিকা ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্ব্বে প্রায় রজস্বলা হয় না। সুতরাং আমার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে, তাহাদিগকে প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক ও অধিকতর প্রশস্ত আশ্রয় প্রদানে সমর্থ হইবে, তৎসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী বলিয়া উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। (বিহারীলাল সরকার ১৩৮৮ ব : ৩৬৮)

বিদ্যাসাগরের এই মতামতকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ স্বাগত জানিয়েছিল। বিহারীলাল সরকার এবং সুবলচন্দ্র মিত্রের মতো জীবনীকাররা বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রানুগত্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রানুগত্য এবং সরকারি আইনের জন্য আবেদনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর মতে শাস্ত্রীয় মীমাংসার যুক্তি নিরর্থক, সরকারি আইনেরও দরকার নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক উন্নতির জোরেই বহুবিবাহের মতো কদর্য অনাচার বিলুপ্ত হবে।

সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লেখেন,

> আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতি-কুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ।...নব্য প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ ; তাঁহাদের যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা তদপেক্ষা অধিক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন। কথা বলা যত সহজ, কার্য করা তত সহজ নহে।

নব্য প্রামাণিক বলতে তিনি 'নব্য সম্প্রদায়ের' উল্লেখ করেন যাঁদের 'পঠদ্দশায়' বড় আস্ফালন, কিন্তু অবশেষে 'সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বয়ং সেই সমস্ত দোষে লিপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন।' (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ : ২১৩)

লোকসমাজের যে-খণ্ডাংশের দুঃখকষ্টে বিদ্যাসাগর বিচলিত তার নিরসনেই তিনি বদ্ধপরিকর হতেন। কোনো সামাজিক বা জাতীয় সমগ্রতার মোহে তিনি বিশেষ লক্ষ্য থেকে সরে যাননি। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে কথা উঠেছিল যে ভারতবর্ষের সব প্রদেশে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত। তাই বাংলা দেশের হিন্দুদের মধ্যে তা নিষিদ্ধ করা অসংগত।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে, এক প্রদেশের কোনো সম্প্রদায়ের প্রার্থনা অনুসারে কেবল তাদের জন্য ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাই রাজার অবশ্যকর্তব্য।

শাস্ত্র বিশ্লেষণে একদিকে বিদ্যাসাগর সনাতন আধার থেকেই তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পান। আবার বিধবা-বিবাহ নিয়ে দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে আমরা পাই দেশাচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের আবেদন। বিদ্যাসাগর লেখেন,

> যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। (গোপাল হালদার স. ১৯৭২ খ : ১৬৫)

এখানে তো বিদ্যাসাগরের সকরুণ মমতা ধর্মশাস্ত্রের বয়ান পেরিয়ে সমাজবিবেকের কাছে এক আর্তিতে মুখর। সে-আর্তিতে ক্রোধ, বিদ্রূপ, শ্লেষের সমাবেশ আর কেবল নৈয়ায়িক যুক্তির মুখাপেক্ষী থাকে না।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে বিদ্যাসাগরের বয়ান শাস্ত্রের নির্বিশেষ মীমাংসা থেকে বারবার বিশেষ বিশেষ কাহিনীর সত্যে চলে যায়। সে-সব কাহিনীতে বহুবিবাহের লাঞ্ছনায় উৎপীড়িত মেয়েদের কথা পাঠকের প্রতিবাদকে যেন এক প্রত্যক্ষ অবলম্বনের শক্তি যোগায়। তাই মনে হয় সমাজসংস্কার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের পুস্তকাবলি নতুন করে পড়বার প্রয়োজন আছে। তা নিশ্চয় শাস্ত্রীয় মীমাংসার জটে জটে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষদর্শী মানবতার আর-এক পরিচয় আমাদের দিতে পারে।

দীর্ঘকাল নিজের স্বাধীন ব্যবসাই ছিল বিদ্যাসাগরের প্রধান জীবিকা। এখানে আধুনিকের নিয়ম তো সব থেকে বেশি মুনাফার জন্য পুঁজির নিয়োগ ও তত্ত্বাবধান। পুস্তক ব্যবসায়ে এই নীতি থেকে বিদ্যাসাগর কখনও বিচ্যুত হননি। গ্রন্থস্বত্ব থেকে বইয়ের দাম ঠিক করা পর্যন্ত কোনো ব্যাপারেই বন্ধুবাৎসল্য বা করুণার টান বিদ্যাসাগরকে প্রভাবিত করে না। সরকারের অনেক বাহানা এবং জনহিতের আবদার উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রকাশিত বইয়ের দাম কমাতে রাজি হননি। নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি দাম কমাবার যে-প্রস্তাব করেন তার জন্য অগ্রিম অর্থ দেওয়ার দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হয়।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতেন। তাঁর মতামত নিয়ে আপত্তি ও বিক্ষোভের দৃষ্টান্ত আছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় আমরা সে-বিষয়ে জানতে পারি। (স্বপন বসু, ১৯৯৩ : ১৬৯-৮৬)

কালিদাস মৈত্র রচিত 'জিওগ্রাফি বা ভূগোল বিজ্ঞাপক' (চারি খণ্ডে বিবৃত) বইটি বিদ্যাসাগর মনোনীত করেননি। তাঁর মতে বইটির ভাষা অশুদ্ধ ও জড়তাগ্রস্ত। বইটিতে হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী কিছু বক্তব্যেও বিদ্যাসাগর গুরুতর আপত্তির কথা তুলেছিলেন। পৃথিবী অচলা, অনন্তনাগের মাথায় অবস্থিত পৃথিবী, কূর্মপৃষ্ঠে অনন্তনাগ এ-সব ধারণা বইটিতে খণ্ডিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের মতামত নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়। সংস্কৃত প্রেসের 'ভূগোল বিবরণ' বইটির কাটতি কমে যাওয়ার আশঙ্কায় বিদ্যাসাগর কালিদাস মৈত্রের বইটি মনোনীত করেননি—এমন অভিযোগও উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় কালিদাস মৈত্র বিরুদ্ধপক্ষে লেখেন। ভূগোল বইটি মনোনীত না হওয়ার কারণ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত আক্রোশ—সে-অভিযোগও ছিল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর জানান যে, শাস্ত্রবিরোধিতার জন্য নয়, বইটিতে বিতর্কমূলক বক্তব্যের আধিক্য এবং সাহিত্যগুণের বালাই নেই বলে তা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়নি। অসৎ উপায়ের অভিযোগে জড়িয়ে না পড়তে বিদ্যাসাগর সতর্ক হন। সরকারের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কমিটিতে (School Book Committee) থাকবার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

কোনো প্রতিকূলতা বিদ্যাসাগরের ব্যবসায়-বুদ্ধিতে নড়চড় ঘটাতে পারেনি। বেশি দামের অভিযোগে সংস্কৃত প্রেসের বইয়ের পরিবর্তে অন্য প্রকাশকের বই নির্বাচনের সরকারি হুমকিতেও বিদ্যাসাগর বিচলিত হন না। পাঠ্যপুস্তকের প্রতিযোগিতায় স্বীয় উৎকর্ষ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। সরকারের পক্ষে বিকল্পের অন্বেষণ বিফল হবে, তা বিদ্যাসাগর বুঝতেন। তবে যে-বিদ্যাসাগর আয়ের ক্ষেত্রে এক কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, ব্যয়ের বহরে এবং বিস্তারে তাঁর কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। গরিব-মধ্যবিত্ত পরিবারের কৃতী জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যাসাগর সাংসারিক দায়দায়িত্বের প্রতিপালনে বিশেষ তৎপর ছিলেন।

কর্মজীবনের আরম্ভ ধরে, এমনকি ছাত্রজীবনে বৃত্তি পাওয়া থেকেই বিদ্যাসাগর স্বোপার্জিত অর্থ নিজেদের একান্নবর্তী পরিবারের সুখসুবিধার জন্য প্রচুর ব্যয় করতেন। আত্মীয় অনাত্মীয় বহু লোকের জন্য তাঁর দানের পরিমাণ বিস্ময়কর। এককালীন দানের প্রাচুর্য ছাড়াও অনেকের জন্য নিয়মিত মাসোহারার বন্দোবস্ত ছিল। খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিধবাবিবাহ সবকিছুর জন্যই বিদ্যাসাগর অকাতরে ব্যয় করতেন। কেবল ব্যক্তিগত দান নয়, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও পরিচালনায় বিদ্যাসাগরের

অদম্য, অফুরন্ত উৎসাহ ছিল। ১৮৬৫-৬৬-র দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বীরসিংহে অন্নসত্র স্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানেও অন্নসত্র স্থাপিত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের প্রতি বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত মমতা এবং নিজের হাতে তাঁদের সেবার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

এ-সব তথ্যে ভরে আছে বিদ্যাসাগরের জীবনী। ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত মানবিক শ্রদ্ধাপ্রীতি মমতার নিবিড়তায় তিনি আগ্রহী ছিলেন। নিজের পিতামাতা, ভ্রাতৃবৃন্দ, প্রয়াত বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অসহায় জননী, পিতামহীর স্মৃতি-বিজড়িত অশ্বত্থবৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাবিস্তার, বিধবাবিবাহ, মাইকেল মধুসূদনকে অকৃপণ সাহায্য, কর্মটাড়ে সাঁওতালদের সঙ্গে সহৃদয় ঘনিষ্ঠতা, এমন-সব বিচিত্র দায়দায়িত্বের অভিজ্ঞতা ব্যেপে জীবনের স্তরে স্তরে বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ মনুষ্যত্ব আমাদের অভিভূত করে। তত্ত্বের কথায় একেই মনে হতে পারে বিদ্যাসাগরের আধুনিক মানবতা।

তবে আশাভঙ্গ অসংগতির যন্ত্রণায় তিনি বারবার আক্লিষ্ট হয়েছেন। ঘরের অশান্তিও ছিল। বাবা ঠাকুরদাস একবার দুঃস্বপ্ন দেখলেন সংসারে ভাঙন আসন্ন। এরপরেই তিনি বারণসীতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে না যেতে অনুরোধ করলেন। ঠাকুরদাস সে-কথা শোনেননি। বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র আবার বাবাকে বারাণসী যেতে উৎসাহিত করেন। পারিবারিক অশান্তি লেগেই ছিল।

নিজের সংসারের অন্দরে বিদ্যাসাগরের অনেক সিদ্ধান্তকে তাঁর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের সংকল্পে মেলানো যায় না। পিতা ঠাকুরদাসের প্রতি ভক্তি ও বশ্যতায় বিদ্যাসাগর পারিবারিক সম্পর্কের দায়কেই বড় ভাবতেন এমন ধারণা ভিত্তিহীন নয়। স্ত্রী দিনময়ীর বিয়ের সময় বয়স ছিল আট বছর। স্ত্রী-শিক্ষার উদ্যোগীপুরুষ বিদ্যাসাগর কিন্তু দিনময়ীকে শিক্ষা দেওয়ার কোনো চেষ্টা করেননি। নিজের মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের কোনো উদ্যোগ জানা যায় না। ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া ঠাকুরদাসের পছন্দ ছিল না। জীবনের 'সর্বপ্রধান' কাজ বিধবাবিবাহের প্রবর্তনের আগে বিদ্যাসাগর বাবার অনুমতি নেন। ঠাকুরদাস অসম্মত হলে বিদ্যাসাগর পিতার জীবদ্দশায় সে-কাজে উদ্যোগী হতেন না, সে-কথা তিনি নিজেই বলেছিলেন।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'তাঁকে তো জানবার যো নাই'। পারলৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে অবশ্য তাঁর বিশ্বাস ছিল। গোড়ায় বিধবাবিবাহের

আন্দোলনে ঠাকুরদাস সম্মতি দেন। পরবর্তী অভিজ্ঞতার নানা বিরুদ্ধতা ও ঘাতপ্রতিঘাতে ঠাকুরদাসের আশঙ্কা হয় যে, তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ সমাগম হবে না। বাবার মনোভাব জানতে পেরে বিদ্যাসাগর বিপুল অর্থব্যয়ে দু-দিন ধরে ব্রাহ্মণভোজনের সমারোহ করেছিলেন। নিজের মা-বাবার শ্রাদ্ধেও বিদ্যাসাগর কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেননি।

নিজের সংসার ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজেও ব্যর্থতার বোঝা বিদ্যাসাগরের কম ছিল না। বহু আন্দোলন, বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের বিশেষ প্রচলন হয়নি। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী সালংকারা কন্যা সম্প্রদান করে বিধবাবিবাহের আয়োজনই ছিল বিদ্যাসাগরের অভিমত। বিয়েতে খরচের দরুন বিদ্যাসাগর ঋণভারে জর্জরিত হন। তবু তিনি ব্যক্তিগত বদান্যতা প্রত্যাখ্যান করেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবাবিবাহের উদ্দেশ্যে কোনো সর্বজনীন অর্থভাণ্ডার সঞ্চিত হলে অন্য কথা ছিল ; তাঁর ঋণের ভার কারও নিতে হবে না। আগে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এমন অনেকেই কথা রাখেননি। এ-সবের প্রতিক্রিয়ায় বিদ্যাসাগরের সেই মর্মান্তিক উক্তি,

> আমার দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ জানলে আমি কখনোই বিধবা বিবাহের মতো উদ্যোগে তৎপর হতাম না। (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ : ৪৮২)

শিক্ষা এবং সমাজসংস্কার নিয়ে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড মধ্যবিত্তের বাইরে ব্যাপক লোকসমাজকে সরাসরি স্পর্শ করেনি। যে-নৃপতির শুভবুদ্ধিতে আস্থা নিয়ে তাঁর কাজের সূচনা, সেই ইংরেজ শাসকদের ধারণাতেই তিনি ভরসা রাখেন। ভাবা গিয়েছিল, মধ্যবিত্তের শিক্ষাদীক্ষার বিকীরণ বৃহত্তর লোকসমাজকেও উপকৃত করবে। সাম্রাজ্যের বেড়াজাল কিন্তু এই মধ্যবিত্তকে কোনো নাগরিক সমাজের সংগতি দেয়নি। শতাব্দীর শেষ দু-তিন দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বহু সমস্যা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষিতের বেকারসমস্যা এবং মধ্যবিত্তের উঁচুনিচু স্তরের মধ্যে প্রভেদের জটিলতা প্রকট হয়। নিজের বহুমিশ্রিত অভিজ্ঞতার পরম্পরায় এই জটিলতার যোগবিয়োগে বিদ্যাসাগর যেন ক্রমশই এক নিঃসঙ্গ মানুষ!

সম্ভবত মধ্যবিত্তের দুর্বল সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে জীবনভর অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা নব্য জাতীয়তাবোধের উদ্যোগ খুব উৎসাহিত করেনি। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা আর নীতিবোধের যে-আদর্শ নির্মাণে বিদ্যাসাগর স্বরচিত পাঠ্যপুস্তকে তৎপর ছিলেন, তার পরিণাম তো ঔপনিবেশিক গৌণতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নিজের ব্যবসাতে মুনাফার যুক্তি তিনি মেনে চলেন।

আবার সমাজসংস্কারের প্রস্তাবে তাঁর যুক্তি শাস্ত্রীয় প্রাকৃপুরাণকে মেনে অগ্রসর হয়। ইতিহাসে তো আমরা পুঁজির নির্ধারণের সঙ্গে যুক্তির যোগাযোগকে মিলিয়ে শুরু করি। এখন পর্যন্ত সেটাই মানুষের একমাত্র ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। বিদ্যাসাগরের সমাজে পুঁজির সে-রকম ভূমিকা ছিল না। পরাধীন উপনিবেশের চৌহদ্দিতে যুক্তির সামাজিক অবলম্বন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আধুনিকের বাঙালি মধ্যবিত্ত অনুষঙ্গে তা নিতান্তই অসম্ভব।

৩

বিদ্যাসাগরের সমাজে যুক্তির গতিপথ বহু দ্বন্দ্বে জর্জরিত। ইউরোপীয় রেনেসাঁস থেকে এনলাইটেনমেণ্ট-এর ভাবাদর্শে অন্য এক জটিলতাও আছে। যুক্তির জয়-যাত্রায় সংযুক্ত ব্যক্তিমানুষের অহমিকা ইতিহাসের অগোচর নয়। জ্ঞানের নতুন দিগন্তের উন্মোচনে এমন বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে 'জ্ঞানেই শক্তি'। মনে হয় পুঞ্জীভূত জ্ঞানের দখলে অসীম কীর্তির সম্ভাবনা ব্যক্তিমানুষের আয়ত্তাধীন। তখন অবিরত সাফল্যের আত্মকেন্দ্রিক প্রত্যয়ে ব্যক্তিমানুষ ভাবেন তিনি পরিত্রাতা, বা অন্তত তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রে তিনি একমাত্র অবিসম্বাদী নায়ক।

তেমন দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের জীবনেও আছে। বিদ্যাসাগরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেন, 'সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, এ-কথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই'।

কৃষ্ণকমল আরও বলেন,

> বিদ্যাসাগরের সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর "সাহেবদের" কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়।...তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এই দৌর্ব্বল্য ছিল, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। "সাহেবদের" নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে "সাহেব" সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। (বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৩৭৩ ব: ৩০, ৪৯-৫০)

আবার শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যুৎপত্তি প্রমাণে তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতো বন্ধু-জনের সঙ্গে তর্কবিতর্ক যে-স্তরে গিয়েছিল তা কেমন বিসদৃশ লাগে। তর্কবাচস্পতির

দায়িত্ব অবশ্যস্বীকার্য। তবে বিদ্যাসাগর তো তর্কের তোড়ে তারানাথের সংস্কৃত জ্ঞান নিয়েও নিদারুণ কটুকাটব্য করেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগে বিদ্যাসাগরের ক্রোধ এবং অনমনীয়তা থেকেই সেই একান্ত দুঃখের ঘটনা।

আশ্চর্য যে, ঘটনাটি এক বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগরের অসম্মতির সঙ্গে জড়িত। ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাশীগঞ্জের কাশীনাথ পালধির বিধবা কন্যা মনোমোহিনী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে নিজের বাড়িতে আসেন। বিদ্যাসাগর নিজেই বিয়ে দেবেন স্থির ছিল। ক্ষীরপাই-এর হালদারবাবুদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর এই বিয়ে স্থগিত রাখতে রাজি হন। তাই নিয়ে ভাইদের সঙ্গে মতভেদ। বিদ্যাসাগরের অমত সত্ত্বেও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের উদ্যোগে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই ঘটনার প্রতি-ক্রিয়ায় বিদ্যাসাগর চিরদিনের জন্য বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। এই বিয়ের বিপক্ষে বিদ্যাসাগর কোনো যুক্তি দেখাননি। তাঁর নিষেধ অমান্য করাতেই তিনি এতটা ক্রুদ্ধ হন।

তবে অহমিকার তাড়নায় বিদ্যাসাগর যুক্তির নিয়মকে কোনো চূড়ান্ত বোঝা-পড়ায় বন্ধ করেননি। সমাজের অণুপরমাণুতে মঙ্গল-অমঙ্গল হিতাহিতের প্রশ্নে তাঁর অন্তরে একটা খোলা মনের দরজা সর্বদাই ছিল। তাই বারবার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যক্ষের উপলব্ধিতেই বিদ্যাসাগর কর্মের নির্দেশ খুঁজেছেন। অবশ্যই তিনি আমাদের ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আজ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও আমরা তো তেমন মুক্তির কোনো হদিস পাইনি। বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষনির্ভর জীবনধর্মী তন্ময়তা ওই আচ্ছন্নের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদের মাহাত্ম্যেও চিহ্নিত হতে চায়।

সূত্র নির্দেশ

অজিতকুমার ঘোষ স. (১৯৭৩), 'রামমোহন রচনাবলী', কলকাতা।

আবুল আহসান চৌধুরী (১৯৮৮), 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার', ঢাকা।

ইন্দ্রমিত্র (১৯৯২), 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', কলকাতা (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯)।

গোপাল হালদার স. (১৯৭২ ক), 'বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, কলকাতা।

গোপাল হালদার স. (১৯৭২ খ), 'বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা।

গোপাল হালদার স. (১৯৭২ গ), 'বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯৪ ব), 'বিদ্যাসাগর', কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৩০২ ব)।

দুর্গাচরণ রায় (১৯৮৪), 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন', কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯)।

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (১৯৯৮), 'টীকা টিপ্পনী', কলকাতা।

প্রসূন বসু প্রমুখ স. (১৩৯১ ব), 'বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র', কলকাতা।

বিজিতকুমার দত্ত স. (১৯৯৫), 'আকাদেমি পত্রিকা ৮', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

বিনয় ঘোষ (১৯৭৩), 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', কলকাতা।

বিনয় ঘোষ স. (১৯৬৬), 'সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র' চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা।

বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৩৭৩ ব), 'পুরাতন প্রসঙ্গ', কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৩২০ ব)

বিহারীলাল সরকার (১৩৮৮ ব), 'বিদ্যাসাগর', কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৩০২ ব)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৪৩ ব), 'কলিকাতা কমলালয়', কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১২৩০ ব)।

শ্রীম কথিত (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) (১৯৮৩), 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা।

মুহম্মদ আবুতালিব স. (১৯৯৫), 'রাজা রামমোহন রায়ের "তুহফা" / উপহার তুহ্‌ফাত্‌-উল্‌-মুআহ্‌হিদীন', মালদা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৪৭ ব), 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা।
রাজনারায়ণ বসু (১৩৫৮ ব), 'সেকাল আর একাল', কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪)।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৩৫৬ ব), 'রামেন্দ্র-রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা।
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৯৯২), 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস', কলকাতা (প্রথম প্রকাশ 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' ১৮৯১, 'ভ্রমনিরাস' ১৮৯৫)।
শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯০৩), 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', কলকাতা।
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১), 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য', কলকাতা।
সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ স. (১৯৮৪), 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা।
সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ স. (১৯৮৯), 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ', চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা।
স্বপন বসু (১৯৯৩), 'সমকালে বিদ্যাসাগর', কলকাতা।
স্বপন বসু (১৯৯৪), "জীবিকার সন্ধানে বিদ্যাসাগর", অশোক সেন স. 'বারোমাস', শারদীয়, কলকাতা।

Sekhar Bandyopadhyay (1995), 'Caste, Widow-remarriage and the Reform of Popular Culture in Colonial Bengal', Bharati Roy ed. *From the Seams of History Essays on Indian Women*, New Delhi.
Anathnath Basu ed. (1941), *Reports on the state of Education in Bengal (1835-38)*, Calcutta.
Lucy Carroll (1983), 'Law custom, and statutory social reform : The Hindu Widows' Remarriage Act of 1856', *The Indian Economic and Social History Review*, 20, 4, Delhi.
Sudhir Chandra (1977), 'The Problem of Social Reform in Modern India. The Study of a case', S. C. Malik ed. *Dissent, Protest and Reform in Indian Civilization*, Simla.
Sudhir Chandra (1992), 'Whose laws ? : Notes on a legitimising

myth of the colonial Indian state,' *Studies in History*, 8, 2. n. s., New Delhi.

Bhupendranath Datta (1944), *Studies in Indian Social Polity*, Calcutta.

J. D. M. Derrett (1957), *Hindu Law Past and Present*, Calcutta.

J. D. M. Derrett (1977), *Essays in Classical and Modern Hindu Law*, Vol. 2, Leiden.

Marc Gallanter (1994), *Law and Society in Modern India*, Delhi, (প্রথম প্রকাশ 1989)

Nagendranath Gupta (1950), *Seven Noble Lives*, Bombay.

Brian A. Hatcher (1996), *Idioms of Improvement Vidyasagar and Cultural Encounter in Bengal*, Calcutta.

Hindu Marriage Customs (Eminent Indian Gentlemen on Hindu Marriage Customs) (1887) Calcutta. ('Hindu Marriage' বলে নির্দেশিত)

M. B. Hooker (1975), *Legal Pluralism, An Introduction to Colonial and New-colonial Laws*, Oxford,

A. P. Howell (1868), *Note on the State of Education in India 1866-67 (Selection from the Records of the Government of India, Home Department, No. LXVII)*, Calcutta.

James Johnston (1884), *Abstract and Analysis of the Report of the 'Indian Education Commission', with notes on 'The Recommendations' in Full*, London.

Julius Jolly (1928), *Hindu Law and Customs*, Calcutta.

P. V. Kane (1974), *History of Dharmaśāstras* (Second edition), Vol. 2, pt. 1, Poona (১৯৪১-এ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত)

K. P. Kapadia (1958), *Marriage and Family in India*, Bombay. (১৯৫৫-তে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত)

D. D. Kosambi (1975), *An Introduction to the Study of Indian History*, Bombay. (১৯৫৬-তে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত)

William Markby (1977), *Hindu and Mahomedan Law*, Delhi
(১৯০৬-তে প্রথম প্রকাশ)

John McGuire (1983), *The Making of a Colonial Mind A Quantitative Study of the Bhadralok of Calcutta 1857-1885*, Canberra.

Subal Chandra Mitra (1975), *Iswar Chandra Vidysagar A Story of His Life and work*, New Delhi (First Published in 1904 from Calcutta)

T. N. Mukharji (1890), *The Sisters of Phulmani (or the Child-wives of India)*, Calcutta, Reprinted from the *Indian Nation.*

S Natarajan (1959), *A Century of Social Reforms in India*, Calcutta / New Delhi / Madras.

H. H. Risley (1891), *The Tribes and Castes of Bengal* Vol. 1, Calcutta.

Jagadish Narayan Sarkar (1984) *Mughal Polity*, Delhi.

L. S. Sastri (1956), The *Child Marriage Restraint Act*, Allahabad.

Asok Sen (1977), *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones,* Calcutta.

Asok Sen *et al* (1982), *Three Studies on the Agrarian Structure in Bengal 1850-1947 (Perspectives in Social Sciences 2)*, Calcutta,

C. E. Trevelyan (1838), *On the Education of the People of India*, Calcutta.

R. N. Vatsa (1971), "The Movement against Infant Marriages in India", *Journal of Indian History*, 49, April / August / December, Trivandrum.

Report of the Indian Law Commission 1879.

Report of the Age of Consent Committee 1928-29, (Joshi Committee বলে নির্দেশিত)

Report of the Hindu Law Committee 1941.

—